হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম

এমাম, হেযবুত তওহীদ

সমগ্র পৃথিবী এখন **সন্ত্রাসবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের** করাল থাবায় আক্রান্ত। যেকোনো মুহূর্তে পরিস্থিতি বিশ্বযুদ্ধের রূপ নিতে পারে। আমাদের এ দেশকেও ইরাক, সিরিয়ার মতো অস্থিতিশীল করে তোলার ষড়যন্ত্র চলছে। এ ষড়যন্ত্র রুখতে হলে জাতির মধ্যে সচেতনতা ও ইস্পাতকঠিন **ঐক্য গড়ে তুলতে হবে**। স্বার্থবাদী একটি শ্রেণি ধর্মবিশ্বাসী মানুষের ঈমানকে বার বার ভুল পথে প্রবাহিত করে জাতির ক্ষতি সাধন করে। ধর্মের এই অপব্যবহার ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে সচেতনতা ও জাতীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন একটি নির্ভুল আদর্শ যা আমরা জাতির সামনে প্রস্তাব করছি। আমরা আন্তরিক, নিঃস্বার্থ ও অকপটভাবে চাই আমাদের **এই প্রিয় মাতৃভূমি** অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি সকল ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ থাকুক।

হেযবুত তওহীদ
gvbeZvi Kj¨v‡Y wb‡ew`Z
www.hezbuttawheed.org

thvMv‡hvM b¤^i
01670174643 | 01711005025 | 01933767725
01559358647 | 01782188237

দৈনিক বজ্রশক্তি
Dainik Bajroshakti

সংকলন

রেজি: ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৯।
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০১৬। মাঘ-ফাল্গুন ১৪২২।
রবি.সানি-জমা.আউয়াল-১৪৩৭। ৩২ পৃষ্ঠা। ১০ টাকা।

জাতির কালঘুম ভাঙ্গাতে
যে সূর্যের উদয়

নৈতিক অবক্ষয়ের নেপথ্যে:
ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের যোগ
এই যুগে কি সম্ভব?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি

ধ্বংস হবে মানবজাতি!

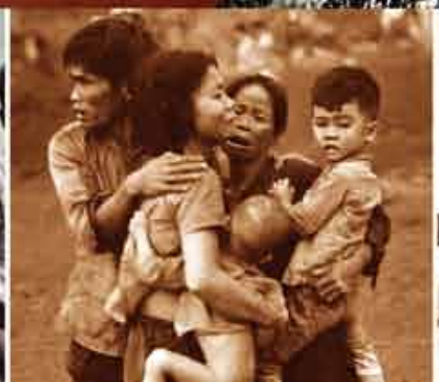

মানবাধিকার
শব্দটি এখন
সাম্রাজ্যবাদী হাতিয়ার

সম্পাদকীয়

টাইম বোমা, নুহের (অ.) নৌকা ও মায়ের জীবন রক্ষা

এমন সঙ্কটমুহূর্ত মানুষের জীবনে প্রায়ই উপস্থিত হয় যখন একজন সন্তানসম্ভবা নারী প্রসব বেদনায় আর্তনাদ করতে থাকেন এবং তাকে জরুরিভাবে অপারেশন থিয়েটারে নিয়ে যাওয়া হয়। কিছুক্ষণ পরে ব্যস্তসমস্ত ডাক্তার বেরিয়ে এসে রোগীর পরিবারকে জিজ্ঞেস করেন যে, 'আপনারা তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেন যে আপনারা রোগীকে বাঁচাবেন না বাচ্চাকে বাঁচাবেন? তাদের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন।' তখন সবাই দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয় যে, 'মাকে বাঁচান।'

পৃথিবীর এখন সেই অবস্থা। আক্ষরিকভাবেই পৃথিবী মানবজাতির মা। এই সন্তানেরা তার মায়ের উপর এমন অন্যায় আচরণ, জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন চালিয়েছে যে আজ মা মৃত্যুশয্যায়। তারা পৃথিবীর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ভারসাম্যকে বহু আগেই ধ্বংস করে দিয়েছে। তারা পানি ও বায়ুমণ্ডল দূষিত করেছে। অসংখ্য প্রজাতির প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ওজনস্তর ক্ষয় করে ফেলেছে, উষ্ণতা বাড়িয়ে বরফ গলিয়ে দিচ্ছে। পারমাণবিক বোমা ফেলে এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করে মাটি পর্যন্ত বিষাক্ত করে দিয়েছে। তাদের খাদ্যে বিষ, কথায় বিষ, তাদের সভ্যতা বিষাক্ত সভ্যতা। অন্যায় অবিচার জুলুম রক্তপাত অশান্তির এক চূড়ান্ত স্তরে উপনীত হয়েছে এই পৃথিবী।

জ্যামিতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি মানবজাতিকে ধ্বংসের কিনারায় এনে পৌঁছে দিয়েছে। মানুষের আবির্ভাবের পর থেকে আধুনিককালের ১৮ শতক পর্যন্ত পৃথিবীর জনসংখ্যা এক বিলিয়ন হতে সময় নিয়েছে কয়েক হাজার বছর। তারপর চমকে যাবার মতো ব্যাপার হলো, এটা দ্বিগুণ হয়ে দুই বিলিয়নে পৌঁছাতে সময় নেয় মাত্র একশ' বছর। সেটা ১৯২০'র দশকের কথা। এরপর মাত্র পঞ্চাশ বছরে সেই সংখ্যাটা দ্বিগুণ হয়ে চার বিলিয়ন হয়ে যায় ১৯৭০'র দশকে। খুব জলদিই এই সংখ্যাটা আট বিলিয়ন হয়ে যাবে। আর এই শতকের মাঝামাঝি জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়াবে ৯ বিলিয়নে। শুধু আজকের দিনটার কথা ধরলেও এই পৃথিবীতে আরো আড়াই লাখ নতুন মানবসন্তান যোগ হয়েছে। আর এটা ঘটছে প্রতিদিন- রোদ হোক, বৃষ্টি হোক, কোনো থামাথামি নেই। বর্তমানে আমরা প্রতি বছর পৃথিবীতে ৯ কোটি ১৩ লক্ষের উপর লোকসংখ্যা যোগ করছি।

পৃথিবীর সম্পদ সীমিত এবং পুঁজিবাদী পদ্ধতির মাধ্যমে সেই সীমিত সম্পদের শতকরা ৯৫ ভাগই চলে গেছে মাত্র ৫%

সূচিপত্র

- *তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি ধ্বংস হবে মানবজাতি!-৩*
- *নৈতিক অবক্ষয়ের নেপথ্যে: ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা-৫*
- *ক্রিকেটের উদীয়মান পরাশক্তি বাংলাদেশকে ঘিরে বৈদেশিক অপতৎপরতা!-৮*
- *সকলেই চান জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধতা এবং জনসচেতনতা কিন্তু কী কথা দিয়ে?-৯*
- *এটাই কি 'সভ্যতার সংঘাত' নয়? -১১*
- *জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থায় জঙ্গিবাদ আরো বেড়েছে-১৩*
- *পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হলো প্রাচ্যে কেন হচ্ছে না?-১৪*
- *জাতির কালঘুম ভাঙ্গাতে যে সূর্যের উদয়-৩০*

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

মানুষের অধিকারে, বাকিরা কোনোমতে প্রাণরক্ষা করে চলেছে। জনসংখ্যার আধিক্য, অসম বণ্টন আর সম্পদের স্বল্পতা মানুষের আত্মাকেও বিনষ্ট করে দেয়। যারা কোনো দিন চুরি করে নি তারাও হয়ে ওঠে চোর। যারা কোনোদিন খুন-খারাবির কথা কল্পনাও করে নি তারাও সন্তানসন্ততিদের জন্য সেই কাজটিই করে। এমতাবস্থায় নিরুপায় হয়ে সরকারগুলো আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে যতই শক্তিশালী করছে, কঠোর থেকে কঠোরতর আইন প্রণয়ন করছে, আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করছে কিন্তু কোনো লাভ নেই। অশান্তি অপরাধ ধাঁই ধাঁই করে বাড়তেই থাকবে।

জনসংখ্যার আধিক্য সমানুপাতিকভাবে মানুষের ভয়ংকর স্বাস্থ্য সঙ্কট সৃষ্টি করে। আত্মার ধ্বংস, সম্পদের ধ্বংস, স্বাস্থ্যের ধ্বংস, জলবায়ুর ধ্বংস সব মিলিয়ে মানবজাতির অস্তিত্ব এখন সংকটে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের আগে নাকি ধরণী পরম ব্রহ্মার নিকট আবেদন করেছিল যে, 'মানুষ আর মানুষের পাপের বোঝা এত বেড়ে গেছে যে আমি আর বইতে পারছি না।' তখন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ সংঘটিত হয় যাতে ১৮ অক্ষৌহিণী সেনা নিহত হয়। বিগত শতাব্দীতে দুটো বিশ্বযুদ্ধে ১১ কোটি মানুষ হত্যা করে পৃথিবীর ভার কমিয়েছে। তারপরে আরো অর্ধকোটি মানুষ নানা যুদ্ধে হত্যা করেছে। এখনো পৃথিবী চিৎকার করে প্রভুর কাছে ভার কমানোর জন্য ক্রন্দন করছে। এখন প্রশ্ন এসেছে এই মানুষ নামক সন্তানগুলো রক্ষা পাবে না মাতা ধরিত্রি রক্ষা পাবে? এই সিদ্ধান্ত নেবে প্রকৃতি। সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকিয়াভ্যালি লিখেছিলেন, "যখন এ বিশ্বের সব জায়গা এমনভাবে মানুষে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে যে তারা বুঝে উঠতে পারবে না কোথায় তারা আছে, অথবা অন্য কোথাও যেতে পারবে না... তখন এ পৃথিবী নিজেই নিজেকে শুদ্ধ করে নেবে।" এই শুদ্ধিকরণ প্রক্রিয়া প্রকৃতি কীভাবে বাস্তবায়ন করবে সে সম্পর্কে গণিতবিদ ম্যালথাসের ভবিষ্যদ্বাণী (১৭৯৮) হচ্ছে, "জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার এই ধরিত্রীতে মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদের উৎপাদনের চেয়ে অনেক বেশি। সে- কারণে মানবপ্রজাতির মধ্যে অকাল মৃত্যুর হার বেড়ে যাবে একটা সময়। মানুষের নৈতিক গুণাবলীর বিনাশের কারণে দ্রুত কমে আসবে জনসংখ্যা। ফলশ্রুতিতে মানবপ্রজাতি হয়ে উঠবে ধ্বংসযজ্ঞের এক বিরাট সৈন্যবাহিনী। প্রায়শই তারা লিপ্ত হবে মারামারি আর খুন খারাবির মতো কাজে। পরিবেশ বিপর্যয়, খারাপ ঋতুর আবির্ভাব, মহামারি, খরা, অতিবৃষ্টি, প্লেগের মতো ভয়ংকর রোগে আক্রান্ত হবে তারা, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে মানুষ মৃত্যুবরণ করবে, দ্রুত কমে আসবে পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা। এরপরও দুর্দশার শেষ হবে না, ধেয়ে আসবে সর্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ, আর এই দুর্ভিক্ষের কষাঘাতে অতি দ্রুত পৃথিবীর জনসংখ্যা হ্রাস পেয়ে সহ্যসীমার মধ্যে চলে আসবে।"

ম্যালাথাসের হিসাব-নিকাশ এখন বাস্তবতা। মানুষ মানুষকে ধ্বংস করার জন্য যথেষ্টের চেয়েও বহুগুণ বেশি অস্ত্র প্রস্তুত করেছে। যেন একটি টাইমবোমার উপর বসে আছে মানবজাতি। ঠিক কোন্ সময় বিস্ফোরিত হবে সেটা আমাদের জানা নেই, তবে যে কোনো মুহূর্তে হবে। যে কোনো ঘটনার প্রেক্ষিতে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যেতে পারে, এমন কি অনেকেই বলছেন যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৯/১১ এর পরই শুরু হয়ে গেছে। টাইমবোমার উপরে বসেই আমরা সংসার করে যাচ্ছি, ধ্বংস হওয়ার জন্য সন্তানদেরকে জন্ম দিচ্ছি। পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো এত বিপুল পরিমাণ পারমাণবিক বোমা তৈরি করেছে যা দিয়ে এই গ্রহটিকেই বহুবার চূর্ণবিচূর্ণ করে ফেলা সম্ভব। তবে পৃথিবী ধ্বংস অর্থাৎ কেয়ামতের সময় আল্লাহ নির্ধারণ করে রেখেছেন। পৃথিবী ও মানবজাতিকে নিয়ে তাঁর যে মহাপরিকল্পনা তা সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীর অস্তিত্ব থাকবে। সুতরাং সন্তানকেই বিদায় নিতে হবে। নুহ (আ.) এর সময় আল্লাহ পুরো মানবজাতিকে বিনাশ করলেও বীজস্বরূপ সত্যনিষ্ঠ কিছু মানুষকে তিনি রক্ষা করেছেন; যা এক প্রকার 'প্রাকৃতিক নির্বাচন' বটে। এখন তেমনিভাবে মানবজাতির কর্মফল ভোগের সময় উপস্থিত। পৃথিবীর উপর তাদের সম্মিলিত জুলুমের ফলে তাদের এখন বিনাশ ঘটবে। আমেরিকা, রাশিয়া, সিরিয়া, ন্যাটো, ইসরাইল, আই এস- এরা সবাই এই ধ্বংসের নিমিত্তমাত্র।

কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসযজ্ঞের পর যেমন নতুন শান্তিময় যুগের সূচনা হয়েছিল, নূহের (আ.) বন্যার পর যেমন নতুন সভ্যতার সূচনা হয়েছিল তেমনি এবার আল্লাহ নতুন বিশ্বব্যবস্থা বাস্তবায়নের জন্য হেযবুত তওহীদকে সৃষ্টি করেছেন। হেযবুত তওহীদ মানবজাতিকে চূড়ান্ত সত্যের দিকে আহ্বান করছে। প্রতিটি শক্তিশালী সত্যের নিজস্ব অভিকর্ষ আছে যা শেষ পর্যন্ত মানুষকে নিজের কাছে টেনে আনবেই। বিশ্ব পরিবর্তনের সুনির্দিষ্ট সময় এসে গেছে। এখন হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে জ্ঞানের একটি বিপুল বিস্ফোরণ ঘটবে, হেযবুত তওহীদ অন্ধকার দূর করতে মানবজাতিকে বোধের আলো প্রদান করবে। মানুষকে শেষ একটি সুযোগ দেবে রসাতল থেকে দূরে সরে সত্যের পথে অগ্রসর হবার। হেযবুত তওহীদ মানবজাতির সামনে নতুন চিন্তাধারার উৎসমুখ খুলে দেবে যা মানবজাতিতে নতুন রেনেসাঁর সূচনা করবে ইনশাল্লাহ।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের পদধ্বনি ধ্বংস হবে মানবজাতি!

কাজী আবদাল্লাহ আল মাহফুজ:

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ! কথাটা শুনে অনেকেই চমকে উঠেন। আবার অনেকে এর সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে চান। যারা চমকে উঠেন তাদের যুক্তি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধলে মানবজাতির কোন অস্তিত্ব থাকবে না। আর যারা উড়িয়ে দিতে চান তাদের যুক্তি মানবজাতি এখন অনেক সভ্য, তারা এমন আত্মহত্যার পথ বেছে নেবে না। অর্থাৎ উভয়ের যুক্তিতেই রয়েছে মানবজাতির ধ্বংস। উভয়েই শংকিত মানবজাতির অস্তিত্ব নিয়ে। কিন্তু যুদ্ধবাজদের কাছে মানবজাতি কোন বিষয় নয়, বিষয় শক্তিতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ। আজ এসকল যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে যে পরিমাণ রাসায়নিক, পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার মজুদ রয়েছে, তা দিয়ে কয়েক মিনিটেই পৃথিবী ধ্বংস করে দেয়া যায়। তাই শত্রুকে মারলে আমিও মরব এই ভয়ই এখন পর্যন্ত তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে তাদের বিরত রেখেছে। এখানে মানবতা নয়, দয়া নয়, ন্যায়ের প্রতি সম্মান নয়, অন্যায়ের প্রতি বিরূপতা নয়, কত কোটি মানুষ, শিশু, পশু নিহত হবে, এসব অনুভূতির কোন স্থান নেই। তার প্রমাণ নাগাসাকি ও হিরোশিমা। তথাপিও অনেকে বলবেন- না, না, মানুষ এমন আত্মহত্যার কাজ করবে না। কিন্তু যে দিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছিল তার আগের দিন যদি সমস্ত পৃথিবীতে একটা গণভোট নেয়া হতো যে, যুদ্ধ চাও কি চাওনা? তবে যুদ্ধের পক্ষে মানুষ কোন ভোট দিত না, দিলেও তা শূন্যের কোঠায় থাকত। এমন কি যারা পরের দিন মহাযুদ্ধ আরম্ভ করেছিল তারাও না। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কি বাঁধেনি? সেই যুদ্ধে চার কোটি মানুষ হতাহত হয় নি? তারপর সেই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মাত্র একুশ বছর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগের দিন যদি আবার যুদ্ধের পক্ষে-বিপক্ষে ভোট নেয়া হতো তারও ফল ঐ আগের গণভোটের মতই হত। কিন্তু তাতে কি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বন্ধ হয়েছে? হয় নি- এবং সে যুদ্ধে সাত কোটি মানুষ হতাহত হয়েছে, বীভৎসভাবে পঙ্গু হয়েছে, কোটি কোটি স্ত্রীলোক বিধবা হয়েছে, কোটি কোটি শিশু বাপ-মা হারিয়েছে, কোটি কোটি স্ত্রীলোক ধর্ষিতা হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জ কেমন করে যুদ্ধ আরম্ভ হলো তা লিখতে যেয়ে লিখেছেন-"We all slithered into it" অর্থাৎ আমরা কেমন যেন পিছলিয়ে ওর মধ্যে পড়ে গেলাম। আর এবারও যে একইভাবে পা পিছলে পড়বে না তার কী গ্যারান্টি আছে? কোন গ্যারান্টি নেই বরং সাম্রাজ্যবাদীরা তার সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করে রেখেছে।

ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলাকালে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে মানুষ কিছুদিন চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। আর সেটি বিনারক্তপাতে ইতি ঘটায় বিশ্ববাসী ধরে নিয়েছিল– বর্তমান সভ্যতার ভোগবাদী মানুষেরা তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধিয়ে হয়তো

তাদের ধ্বংস করতে চাইবে না। কিন্তু যুদ্ধ যাদের জীবিকা, যুদ্ধ যাদের আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার তাদের পক্ষে বেশিদিন নীরব থাকা সম্ভব নয়। আবার যুদ্ধে যারা পরাজিত হয়, তাদের পক্ষেও মার খাওয়ার গ্লানি মুছে ফেলা সহজ নয়। তার প্রমাণ মিলল অল্পদিনেই। বিশেষ করে ঠাণ্ডা যুদ্ধে কমিউনিজমের পতনের পর পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীদের সামনে স্বাভাবিকভাবেই এসে পড়ল খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ মুসলিমরা। এক ঢিলে দুই পাখি। ভবিষ্যৎ মুসলিম আধিপত্যকে রোধ করা এবং একইসাথে তেল ও খনিজ সম্পদ লুটে নেয়ার জন্য এক বছরের মধ্যে শুরু হলো উপসাগরীয় যুদ্ধ। যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক এ যুদ্ধের মাধ্যমে তারা মুসলিমদের শক্তি-সামর্থ্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে রচিত হলো দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা। আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদের উত্থান এবং তা দমন। তারপর একের পর এক মুসলিম দেশে আক্রমণ ও ভিন্নভাবে সরকার পতনের মাধ্যমে চলল সেই দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন। ধ্বংস হয়ে গেল ইরাক, ইয়েমেন, সিরিয়া। উত্থান হলো আইএস'র। এবার আইএস নিয়ে শুরু হলো ইঁদুর বিড়াল খেলা। উঠে এলো সেই পুরনো মারখাওয়া শত্রু রাশিয়া। মধ্যপ্রাচ্যে এই চরম অস্থিতিশীল অবস্থা পশ্চিমাবিশ্ব ও রাশিয়ার মধ্যে আবার শুরু করে দিল আধিপত্য বিস্তারের লড়াই। কারণ খুব সহজ, আধিপত্য বিস্তার, অস্ত্রব্যবসা, খনিজ ও তেলসম্পদ। ওদিকে শত-সহস্র বছরের শত্রুতা, শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব এখন প্রকাশ্য লড়াইতে পরিণত হয়েছে, ইতোমধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে তাদের আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে জোট-মহাজোট গঠন শুরু হয়েছে এবং পরাশক্তিগুলো একে মওকা হিসেবে নিচ্ছে। এ আধিপত্য বিস্তারের লড়াই এখন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করছে। এটা কোনো অমূলক বিষয় নয়। এ নিয়ে আমাদের দেশের মানুষের তেমন মাথাব্যথা না থাকলেও বিশ্বব্যাপী চলছে জল্পনা-কল্পনা, রাজনৈতিক বিশ্লেষণ ও প্রস্তুতি। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের ডেইলি স্টার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং গা শিউরে ওঠার মতো সংবাদ। পাঠকদের উদ্দেশে সংবাদটি তুলে ধরা হলো-

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাঁধাবে রাশিয়া?

সিরিয়া ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি নিচ্ছে রাশিয়া। এ যুদ্ধে 'হাইড্রোজেন বোমা' ও 'কিয়ামতের বিমান' ব্যবহার হতে পারে। প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন 'কেয়ামতের বিমান' দ্রুত অভিযান-উপযোগী করার নির্দেশ দিয়েছেন।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে স্থলে থাকা নিয়ন্ত্রণ কক্ষও যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে রাশিয়ার 'কেয়ামতের বিমান' উড়ন্ত নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে কাজ করবে। আর এই বিমানগুলো এমনভাবে তৈরি করা হয় যে এদের পরাজিত করা প্রায় অসম্ভব। এ ধরনের ইলিউশিন টু-৮০ মডেলের বিমানগুলোকে দুই সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী করার নির্দেশ দিয়েছেন পুতিন। বিশ্বে শুধু যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার কাছেই রয়েছে এ ধরনের বিমান। যুক্তরাষ্ট্র এগুলোকে 'কেয়ামতের বিমান' বলে থাকে। আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়েছে এরই মধ্যে বিমানগুলোর পরীক্ষামূলক উড্ডয়নও সম্পন্ন হয়েছে।

রাশিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলেছিলেন, উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এই যুদ্ধবিমানগুলো ২০১৫ সালের শেষের দিকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হবে। কিন্তু পুতিন দুই সপ্তাহের মধ্যে এগুলোকে প্রস্তুত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হওয়ায় এমন নির্দেশ দেয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর আগে ১ সেপ্টেম্বর থেকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত হাইড্রোজেন বোমার প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা হয় মস্কোতে।

হাইড্রোজেন বোমা কী?

পারমাণবিক বোমা থেকে অনেক বেশি শক্তিশালী হাইড্রোজেন বোমা। নক্ষত্রে যে প্রক্রিয়ায় আলোক তৈরি করে হাইড্রোজেন বোমা ঠিক সেই প্রক্রিয়ায় কাজ করে। হাইড্রোজেন বোমার ভেতরে একটি মিনি সাইজের এটমবোমাও থাকে। বিস্ফোরণের পূর্ব মুহূর্তে বোমার ভেতরে একীভবনের ক্রিয়াটি শুরু করার জন্যই একে ধরে রাখা হয়। মূল বোমাটি বিস্ফোরণের আগেই এটি বিস্ফোরিত হয়। এএন৬০২ হাইড্রোজেন বোমাকে সংক্ষিপ্তাকারে জার বোমা বা এইচ বোমা নামে ডাকা হয়। ১৯৫৩ সালে এটি তৎকালীন

কার কাছে কতটি পরমাণু অস্ত্র আছে:

সোভিয়েত ইউনিয়নের রাশিয়ায় আবিষ্কৃত হয়। সোভিয়েত পরমাণুবিজ্ঞানী আন্দ্রে শাখারভ হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কার করেন। এই বোমাকে সব বোমার জনক বলে ঘোষণা করা হয়। এ বোমার প্রতি ইঙ্গিত করে ১৯৬০ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রকে একহাত দেখিয়ে নেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তৎকালীন সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ। ১৯৬১ সালের ৩০ অক্টোবর মেরুবৃত্তের ভেতরের দ্বীপ নোভায়া জেমলিয়ায় ৫৮ মেগাটনের এই হাইড্রোজেন বোমাটির বিস্ফোরণ ঘটায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হিরোশিমায় ফেলা বোমার চেয়ে এই হাউড্রোজেন বোমাটি তিন হাজার গুণ বেশি শক্তিশালী ছিল।

প্রতিরক্ষা ওয়েবসাইট এটমিক আর্কাইভের প্রতিবেদন অনুযায়ী, পরমাণু বোমা যেখানে জীবাশ্ম প্রতিক্রিয়ায় কাজ করে, হাইড্রোজেন বোমা সেখানে ধ্বংসাত্মক গলন মিশ্রণ প্রতিক্রিয়া করে। পরমাণু বোমার চেয়ে যা কয়েক গুণ ক্ষতিসাধন করতে পারে। হাইড্রোজেন বোমা বিশ্বের পাঁচটি দেশের (রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও চীন) কাছে রয়েছে। এবং গত ৬ জানুয়ারি উত্তর কোরিয়া হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা চালিয়েছে বলে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে খবর এসেছে।

কেয়ামত বিমান কী?

রাশিয়ার ইলিউশিন টু-৮০ বিমানকে যুক্তরাষ্ট্র 'ডুমস ডে প্লেন' বা 'কেয়ামত বিমান' বলে অভিহিত করে। রুশ বিমান গবেষণা ও প্রস্তুত প্রকল্পের মহাপরিচালক আলেকসান্দ্র কমিয়াকভ বলেন, এই বিমানের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এটি অজেয়, একে পরাজিত করা যায় না। ভূমিতে কোনো নির্দিষ্ট স্থান থেকে যুদ্ধের নির্দেশ দেয়া হলে তা শনাক্ত এবং ধ্বংস করা সম্ভব। কিন্তু বিমানকে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ হিসেবে ব্যবহার করে আকাশ থেকে নির্দেশ দিলে তা শনাক্ত করা খুবই কঠিন।

নিজেদের মূল কাজ সম্পর্কে কমিয়াকভ বলেন, অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যোগাযোগটা বজায় রাখাই হচ্ছে এর প্রধান কাজ। মাটিতে থাকা অবকাঠামো যদি ধ্বংসও হয়ে যায়, তবু যেন যুদ্ধ ও পরিকল্পনা ঠিক থাকে, সেটা এখান থেকে লক্ষ্য রাখা হবে।

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে কারা জিতবে?

তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মানবজাতির অস্তিত্ব থাকবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিশেষজ্ঞরা। ইউকে ডেইলি স্টারের একটি জরিপ অনুযায়ী, মাত্র ২৬ শতাংশ মানুষ মনে করে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ হলে আগের দুটোর মতো যুক্তরাষ্ট্র-ব্রিটেন জয়লাভ করবে। অন্যদিকে অনেকেই মনে করে, রাশিয়া এখন ভাল্লুক। তাকে খেপিয়ে তুললে কেউ টিকবে না। ওই জরিপে আইএসকে তেলাপোকার সঙ্গে তুলনা করে বলা হয়েছে- বিশ্ব ধ্বংস হলেও তেলাপোকা টিকবে। তবে ৫৪ শতাংশ মানুষ মনে করে, এ যুদ্ধে কেউই জয়ী হবে না, মানবজাতি ধ্বংস হবে।

নৈতিক অবক্ষয়ের নেপথ্যে: ধর্মনিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতার চর্চা

রিয়াদুল হাসান

আদম (আ.) থেকে মোহাম্মদ (সা.) পর্যন্ত আল্লাহ অসংখ্য নবী রসুল পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। তাঁরা তাদের জাতির কাছে যে জিনিসটা নিয়ে এসেছেন তা হলো তওহীদ অর্থাৎ এক স্রষ্টার হুকুম, এক কথায় জাতীয় এবং ব্যক্তিগত জীবনে সত্যের পক্ষে ও মিথ্যার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। এই পথে যখন জাতি চলেছে তখন তারা ফলস্বরূপ শান্তিপূর্ণ ভারসাম্যযুক্ত সমাজ পেয়েছে।

নবী রসুল পাঠানোর ধারাবাহিকতায় শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) এর আগমনের প্রায় ৫০০ বছর আগে আল্লাহ পাঠালেন ঈসাকে (আ.)। তাঁকে পাঠানো হয়েছিল শুধুমাত্র মুসা (আ.) এর অনুসারী ইহুদি জাতির কাছে। তিনি এসেছিলেন মুসা (আ.) এর আনীত দীনকে সত্যায়ন করে শুধু মাত্র দীনের হারিয়ে যাওয়া আত্মিক ভাগটাকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে দীনের ভারসাম্য পুনঃস্থাপনের জন্য। তিনি কখনই খ্রিষ্ট ধর্ম নামে নতুন কোনো ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চান নি। ঈসা (আ.) যদি ইহুদিদের বাইরে তার দেখানো পথ অনুসরণ বা গ্রহণ করতে বলতেন তাহলে তা হতো অনধিকার চর্চা। কারণ স্রষ্টা তাঁর

কাজের সীমারেখা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র ইহুদিদের ভেতরে। তিনি তাঁর সীমারেখার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন, I was sent only to the lost sheep of Israel. (Matthew 15 অর্থাৎ আমি শুধু মাত্র বনি ইসরাইলের পথভ্রষ্ট মেষগুলোকে পথ দেখাতে এসেছি।

এভাবে ঈসা (আ.) যখন তাঁর প্রচার কাজ শুরু করলেন তখন পূর্ববর্তী দীনের বিকৃত রূপের যারা ধারক বাহক ছিলেন তারা তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। ঈসা (আ.) তাদেরকে বড় বড় মো'জেজাগুলো দেখানোর পরও তারা কেউই তাঁকে স্বীকার করল না। শুধুমাত্র সমাজের নিচুশ্রেণীর হাতে গোনা কিছু ইহুদি তাঁর প্রতি ঈমান আনলো। বিকৃত দীনের ধারক বাহক রাব্বাই, সাদ্দুসাইরা তাদের তখনকার প্রভু রোমানদেরকে এই কথা বোঝাতে সক্ষম হলো যে, ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) রোমানদের প্রভুত্বের ক্ষেত্রে বড় হুমকি হিসাবে আবির্ভূত হবে। ফলে এই পুরোহিতরা রোমানদের সাহায্য নিয়ে ঈসা (আ.) কে হত্যার চূড়ান্ত ব্যবস্থা করল। তখন আল্লাহ তাকে সশরীরে পৃথিবী থেকে উঠিয়ে নিলেন এবং বিশ্বাসঘাতক জুদাসকে শাসকগোষ্ঠী ঈসা (আ.) মনে করে হত্যা করল। এই ঘটনার পর ঈসার (আ.) অনুসারীরা প্রাণভয়ে বিভিন্ন জায়গায় পালিয়ে গেল।

কিছুদিন পর পল নামের একজন লোক ঈসা (আ.) এর উপর বিশ্বাস আনলো। তবে তার পরবর্তী কাজগুলো বিবেচনা করলে বোঝা যায় যে, ঈসা (অ া.) এর অনুসারীদের মাঝে ঢুকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। ঈসা (আ.) তাঁর অনুসারীদেরকে বারবার যে কাজে সাবধান করে দিয়েছিলন অর্থাৎ অ-ইহুদিদের মাঝে তাঁর শিক্ষা প্রচার করা যাবে না, কিন্তু পল তার অনুসারীদেরকে এই শিক্ষা ইহুদিদের বাইরে প্রচার করা শুরু করলো। তবে তিনি যে শিক্ষা প্রচার করেছিলেন তা যে শুধু ঈসা (আ.) এর ধর্মের থেকে বহু দূরে তাই নয়, প্রধান প্রধান ব্যাপারে একেবারে বিপরীত। ঈসা (আ.) এর প্রায় তিনশ বছর পর রোম সম্রাট কনস্ট্যানটাইন খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই ধর্মবিস্তারে মনোযোগ দেন। এই নতুন ধর্মটি ক্রমে ক্রমে সমস্ত ইউরোপে রাষ্ট্রধর্মরূপে গৃহীত হয়ে গেল। স্মরণাতীতকাল থেকে রাষ্ট্র সর্বদাই চলেছে ধর্মীয় বিধি বিধান, আইন কানুন দ্বারা। স্বভাবতই খ্রিষ্টধর্মকে যখন সমস্ত ইউরোপ গ্রহণ করে নিল তখন তারাও চেষ্টা করল খ্রিষ্টধর্মকে দিয়ে তাদের জাতীয় জীবন পরিচালনা করার জন্য। কিন্তু খ্রিষ্টধর্মে তো কোনো আইন কানুন, দণ্ডবিধি নেই অর্থাৎ রাষ্ট্র পরিচালনার বিধান নেই। তাই খ্রিষ্টধর্ম সমষ্টিগত জীবন পরিচালনা করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হলো। প্রতিপদে ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক অঙ্গনে সংঘাত আরম্ভ হলো। এই সংঘাতের বিস্তৃত বিবরণে না গিয়ে শুধু এটুকু বললেই চলবে যে, এই সংঘাত এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ইউরোপীয় নেতা, রাজাদের সামনে দুইটি মাত্র পথ খোলা রইল। হয় এই ধর্মকে সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে হবে, নইলে তাকে নির্বাসন দিতে হবে মানুষের ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র গণ্ডির ভেতরে। তৃতীয় আর কোনো রাস্তা রইল না। যেহেতু সমস্ত ইউরোপের মানুষকে নাস্তিক বানানো সম্ভব নয়, কাজেই তারা দ্বিতীয় পথটাকেই বেছে নিল। রাজা অষ্টম হেনরীর সময় ইংল্যান্ডে প্রথম আনুষ্ঠানিকভাবে ধর্মকে সার্বিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসিত করা হয়। এরপর থেকে খ্রিষ্টান জগতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন দণ্ডবিধি ইত্যাদি এক কথায় জাতীয় জীবনে স্রষ্টার আর কোনো কর্তৃত্ব রইল না। জন্ম হলো ধর্মনিরপেক্ষতার।

আপাতদৃষ্টিতে এই ঘটনাটিকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও মানবজাতির ইতিহাসে এই ঘটনাটি সবচেয়ে বড় ঘটনা। এই প্রথম মানুষ তাদের জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত জীবনে নির্বাসন দেওয়ার ফলে হয়তো এ আশা করা যেত যে জাতীয় জীবনে ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড না থাকায় সেখানে যত অন্যায়ই হোক ধর্মের প্রভাবে ব্যক্তি জীবনে মানুষ ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক মূল্যবোধ পূর্ণ থাকবে। কিন্তু তাও হয় নি। কারণ মানুষের শিক্ষা ব্যবস্থার ভার রইল ঐ ধর্মনিরপেক্ষ কার্যত ধর্মহীন, ন্যায়-অন্যায় বোধহীন জাতীয় ভাগটার হাতে। সুতরাং অনিবার্য ফলস্বরূপ ব্যক্তিগত জীবন থেকেও ধর্মের প্রভাব আস্তে আস্তে লুপ্ত হয়ে যেতে শুরু করল। স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধানে যে দেহ ও আত্মার ভারসাম্য ছিল তার অভাবে ঐ শিক্ষা ব্যবস্থায় যে মানুষ সৃষ্টি হতে লাগল তাদের শুধু একটি দিকেরই পরিচয় লাভ হলো-দেহের দিক, জড়, স্থূল দিক, স্বার্থের দিক, ভোগের দিক। জীবনের অন্য দিকটার সাথে তাদের পরিচয় বিলুপ্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ 'ধর্মনিরপেক্ষতা' সৃষ্টি করে তা জাতীয় জীবনে প্রয়োগ করার ফলে শুধু জাতীয় জীবনই অন্যায়-অত্যাচার, অশান্তি ও রক্তপাতে পূর্ণ হয়ে যায় নি, যেখানে ধর্মকে টিকে থাকার অধিকার দেয়া হয়েছিল অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, সেখানেও অধিকাংশ মানুষের জীবন থেকে ধর্ম বিদায় নিয়েছে, নিতে বাধ্য হয়েছে। দেহ থেকে আত্মা পৃথক করার পরিণাম এই হয়েছে যে, মানুষের মনুষ্যত্ব লোপ পেয়ে তাদের ব্যক্তিত্ব পশুর পর্যায়ে নেমে গেছে।

আমরা সমাজে প্রচলিত অন্যায় অপরাধের জন্য ব্যক্তি

বা গোষ্ঠীকে দায়ী করে থাকি কিন্তু একটু গভীরে গেলেই আমরা দেখব যে, এই সকল অশান্তির জন্য এই ধর্মনিরপেক্ষ সিস্টেমই দায়ী। মানুষ প্রকৃতপক্ষে কাদামাটির ন্যায়। এই কাদামাটিকে যে ছাঁচ বা ডাইসের মধ্যেই ফেলা হবে, কাদামাটি সেই ডাইসের আকার ধারণ করবে। কখনও কোনো মানুষ মায়ের গর্ভ থেকে চোর হয়ে, ডাকাত হয়ে, অন্যায়কারী, দূর্নীতিবাজ হয়ে জন্ম নেয় না। কিন্তু অন্যায় সমাজব্যবস্থার প্রভাবে তারা ধীরে ধীরে এমন অপরাধী চরিত্রের হয়ে যায়। অন্যান্য জাতির মত আমরাও এমনই এক স্রষ্টা বিবর্জিত আত্মাহীন সিস্টেম গ্রহণ করেছি, যার আবশ্যম্ভাবী ফল আমরা এড়াতে পারছি না। মানুষ হয়ে যাচ্ছে আত্মাহীন পশু। এই সিস্টেমে খুব সহজেই মানুষের সদগুণাবলীকে অসদগুণাবলী দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। শত চেষ্টা করেও মানুষ ভালো হয়ে থাকতে পারছে না।

ধর্মহীন জীবন ব্যবস্থার প্রভাবে ব্যক্তিজীবন থেকেও ধর্ম লুপ্ত হয়ে মানবসমাজে চরম নৈতিক অবক্ষয় সৃষ্টি হয়েছে। সর্বত্র বিরাজমান স্রষ্টার ভয়ে ধর্মবিশ্বাসী মানুষ অপরাধ করে না, কিন্তু স্রষ্টাহীন জীবনব্যবস্থায় কর্তৃপক্ষের চোখ ফাঁকি দিতে পারলেই অপরাধ সংঘটন করে। একারণেই সর্বপ্রকার অপরাধ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। একদিকে প্রযুক্তির উন্নয়ন, অপরদিকে মনুষ্যত্বের চরম অধঃপতন পৃথিবীতে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মানবজাতির জন্য স্রষ্টার নেয়ামত, কিন্তু আজ এগুলো যতটা না মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে তার বহুগুণ ব্যবহৃত হচ্ছে মানবতার বিরুদ্ধে। সংবাদপত্রগুলো দুঃসংবাদে ভরা, রাজনীতি আর মিথ্যা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে, নিকৃষ্ট মানুষ সম্মানিত হচ্ছে। ধর্মকে জাতীয় জীবন থেকে নির্বাসন দেওয়ার পরিণামেই এই ভয়ঙ্কর বস্তুবাদী সভ্যতার জন্ম হয়েছে। তাই একে আল্লাহর রসুল দাজ্জাল অর্থাৎ একটি পরাশক্তিধর একচক্ষুবিশিষ্ট দানবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের জন্য ধর্মকে বিসর্জন করার প্রয়োজন নেই, ধর্মকে বাদ দিলে জ্ঞান বিজ্ঞানের ব্যবহার হয় মানুষের ক্ষতিসাধনে। এটা ভুলে গেলে চলবে না যে, ইসলামের সোনালি যুগে অর্থাৎ ১২৫৮ সনে আব্বাসীয় খেলাফতের পতন পর্যন্ত বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় মুসলিমরাই ছিল শিক্ষকের আসনে। ঐ সময়ে ইউরোপে চলছিল মধ্যযুগীয় বর্বর যুগ, অন্ধকার যুগ (Dark age- 6th to 13th centuries)। আজকের আধুনিক বিজ্ঞানে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া আধিপত্য যার ভিত্তি রচনা করে গেছেন মুসলিম বিজ্ঞানীরাই। এটা ইতিহাস যদিও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পরিকল্পিতভাবে সেগুলো চাপা দেওয়া হয়েছে।

মূলত নৈতিক মূল্যবোধের জাগরণ ব্যতীত একটি কল্যাণকর মানবসমাজ কল্পনা করা যায় না। আর নৈতিক শিক্ষার মূল বিষয়টি ধর্মীয় শিক্ষা থেকে উৎসারিত। মানবসমাজে বিরাজিত সকল নৈতিকতার মূল ভিত্তি হলো, অতিপ্রাকৃতিক শক্তি তথা সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাস। এ বিশ্বাসই ব্যক্তিকে স্রষ্টার আদেশ ও নিয়ম অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করে, পৃথিবীতে ও পরলোকে কু-কর্মের শাস্তি সম্পর্কে অবহিত করে এবং ভালো কাজের জন্য পুরস্কৃত হতে উৎসাহ দেয়। স্রষ্টায় বিশ্বাসের কারণেই ব্যক্তি সবচেয়ে গোপন ও নিরাপদ জায়গাতেও শত প্রলোভন সত্ত্বেও অনৈতিক কোনো কাজে জড়িত হতে পারে না। কিন্তু এ বিশ্বাসের বীজ যার হৃদয়ে বপিত হয় নি তার কাছে নৈতিকতা অর্থহীন মনে হয়। ধর্মীয় শিক্ষা ব্যতীত নৈতিক শিক্ষা ভঙ্গুর ও বিক্ষিপ্ত এবং এগুলোর আদি উৎসও ধর্ম। ধর্মীয় শিক্ষার বাইরে যে নৈতিক শিক্ষার কথা বলা হয় তাতে ব্যক্তি নিজের বিবেকের কাছে তার দায়বদ্ধতার কারণে নীতি মেনে চলে। ফলে ব্যক্তি যেকোনো দুর্বল মুহূর্তে প্রলোভনে পড়ে কিংবা মানবিক দুর্বলতার কারণে তার নৈতিক গণ্ডির বাইরে চলে যেতে পারে। সে তো পরকালীন শাস্তির ভয়ে নীতি মানছে না, তাই একবার ভাঙলে আবার তা গড়ে তোলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা পায় না। সে ভাবে যে, নশ্বর এই পৃথিবীতে ভোগ-বিলাস ও আরাম-আয়েশের মধ্য দিয়ে জীবন কেটে গেলেই হলো।

সুতরাং ধর্মকে কাজে লাগিয়েই সামষ্টিক মানুষের চারিত্রিক কাঠামোকে সুদৃঢ় করা সম্ভব, অন্যভাবে নয়। শিশুকাল থেকেই এ চরিত্রগঠনের প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে হয় কেননা ব্যক্তির মানসিক গঠনের উপযুক্ত সময় তার শৈশব ও কৈশোর। এ সময় শিশুকে যেভাবে শিক্ষা দেয়া হবে তার গন্তব্যও সেদিকেই হবে। আমরা সবাই চাই, আমাদের শিশুরা জ্ঞানে-গুণে, যোগ্যতা-দক্ষতায় অনন্য হোক এবং তাদের সেই জ্ঞান ও দক্ষতা কল্যাণকর কাজে ব্যবহৃত হোক। অথচ তাদেরকে আমরা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সকল নৈতিকতার উৎস ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে রাখছি। বেঁচে থাকার জন্য যেমন মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন, তেমনি সেই মানুষগুলোকে মনুষ্যত্বসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজন প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা। বিকৃত ধর্ম সমাজকে আরো দূষিত করবে। প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা যেমন পরিবার ও সমাজের পক্ষ থেকে দিতে হবে তেমনি দিতে হবে রাষ্ট্রের উদ্যোগেরও মাধ্যমে। সেই শিক্ষা আমাদের কাছে আছে এবং আমরা তা প্রচার করে যাচ্ছি।

ক্রিকেটের উদীয়মান পরাশক্তি বাংলাদেশকে ঘিরে বৈদেশিক অপতৎপরতা!

শাকিলা আলম

বাংলাদেশকে ঘিরে বৈদেশিক ষড়যন্ত্র চলছে এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। সর্বোতভাবে দেশি-বিদেশি একটি মহল চেষ্টা করছে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে জঙ্গিরাষ্ট্র হিসেবে চিত্রিত করতে। সেই চক্রান্তকারীদের শ্যেনদৃষ্টি থেকে বাদ পড়েনি বাংলাদেশের ক্রিকেটও। ২০১৫ সাল এ দেশের ক্রিকেটের জন্য 'গোল্ডেন ইয়ার' হয়ে থাকবে এ কথা ঠিক, কিন্তু এ বছরটিতে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা বিশ্লেষণ করলে আঁতকে উঠতে হয় এই ভেবে যে, আমাদের ক্রিকেটের এই উন্নতি একটি মহলকে কতটা নিরাশ করেছে, কতটা আঘাত লেগেছে তাদের অহমিকায়। তারা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ক্রিকেটকে নিয়ে একের পর ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করছে।

২০১৫ সাল ছিল বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সোনা দিয়ে মুড়িয়ে রাখার মতো একটি বছর। এ বছরই বিশ্বকাপে প্রথম বারের মতো গ্রুপ পর্বের গন্ডি পেরিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠে মাশরাফি বাহিনী। ভারতের কাছে বিতর্কিত ওই ম্যাচটিতে হার স্বীকার করতে হয়েছিল বাংলাদেশকে। আমপায়াররা পক্ষপাতমূলক সিদ্ধান্ত না দিলে ওই বিশ্বকাপে বাংলাদেশের অর্জন আরও মাত্রা ছাড়িয়ে যেত বলেই এ দেশের ক্রিকেটভক্তদের বিশ্বাস। সেই বিশ্বাস যে অলীক ছিল না তারই যেন প্রমাণ দিয়ে গেছে টাইগাররা বছরব্যাপী। প্রথমে পাকিস্তানকে হোয়াইট ওয়াশের লজ্জা উপহার দেওয়া, তারপর ক্রিকেটের অন্যতম বড় মোড়ল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকাকে নাকানি-চুবানি খাইয়ে রীতিমতো সারা বিশ্বের ক্রিকেটাঙ্গনে তোলপাড় সৃষ্টি করে বাংলাদেশ দল। ২০১৪'র শেষ থেকে ২০১৫'র শেষ পর্যন্ত টানা চারটি 'ওয়ান ডে' সিরিজ খেলে চারটি সিরিজেই জয় পায় বাংলাদেশ। সাফল্যমণ্ডিত ওই ম্যাচগুলোতে একের পর এক রেকর্ড নিজেদের ঝুলিতে ভরতে থাকে টাইগাররা। সব মিলিয়ে ২০১৫ সালের একদিনের ক্রিকেটে জয়-পরাজয়ের ভিত্তিতে অস্ট্রেলিয়ার পরেই উঠে আসে বাংলাদেশের নাম। আর আইসিসি 'ওয়ান ডে' র‍্যাঙ্কিং- এ বাংলাদেশ পাকিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টপকে প্রথমবারের মতো উঠে আসে সাত নম্বরে।

ক্রিকেটে বাংলাদেশের এই হঠাৎ জ্বলে ওঠা ও ধারাবাহিকভাবে ক্রিকেটের পরাশক্তিগুলোকে নাস্তানাবুদ করার ঘটনায় যখন অনেকেই স্বীকার করছেন যে, ক্রিকেটে বাংলাদেশ এক উদীয়মান পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে যাচ্ছে, ঠিক তখনই এ দেশের ক্রিকেটের ভবিষ্যতকে অন্ধকার করার অপচেষ্টা শুরু হয়েছে। ক্রিকেটের অঘোষিত মোড়ল দেশগুলোর সাথে বনিবনা না হওয়ায় আইসিসির প্রেসিডেন্ট পদ থেকে ইস্তফা দিতে হয়েছে বাংলাদেশের ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব আ হ ম মোস্তফা কামালকে। এদিকে ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিতব্য 'আইসিসি চ্যাম্পিয়নস ট্রফি' তে খেলার নিশ্চিত সুযোগ থেকে বাংলাদেশকে বঞ্চিত করার অপচেষ্টাও কম হয় নি। তবে বাংলাদেশের ক্রিকেটের জন্য সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি আসে অস্ট্রেলিয়া দল 'জঙ্গি হামলা' হতে পারে এমন নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে বাংলাদেশে খেলতে আসতে অস্বীকৃতি জানালে। প্রথমে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল, তারপর দেশটির ফুটবল টিম। সবশেষে দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ক্রিকেট দলের বাংলাদেশে সফর স্থগিত করা হয় ওই একই অজুহাতে। অবাক করা বিষয় হচ্ছে, অস্ট্রেলিয়া দল যখন প্রথম এই অজুহাত উত্থাপন করে তখন বাংলাদেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় ভালো ছিল। টিম অস্ট্রেলিয়ার বাংলাদেশে খেলতে না আসা ও জঙ্গিবাদের অভিযোগ উত্থাপনের ঘটনাকে বাংলাদেশের ক্রিকেটের বিপক্ষে ষড়যন্ত্র বলে আখ্যায়িত করেন বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন।

বাংলাদেশের মাটিতে এ পর্যন্ত ৭৫ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। 'এশিয়া কাপ' থেকে শুরু করে বিশ্বকাপের আসরও অনুষ্ঠিত হয়েছে এ মাটিতে। তখন জঙ্গি হামলা তো দূরের কথা বরং দক্ষিণ আফ্রিকান গ্রেট বোলার স্টেইনদেরকে বৃষ্টিতে ভিজে শহরের গলিতে সাধারণ মানুষদের সাথে খেলতে দেখেছে বিশ্ববাসী। কারো কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই এই ৭৫ টি ম্যাচের কোনটিতে বিদেশি খেলোয়াড়রা কোন প্রকার সমস্যায় পড়েছে। অথচ হঠাৎ নিরাপত্তাহীনতার অজুহাত দেখিয়ে একের পর এক চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে বাংলাদেশের উপর।

এ জঙ্গি ইস্যু নিয়ে দীঘ দিন ধরে কাদঁছে পাকিস্তান-আফগানিস্তান। দেশদুইটির ক্রিকেট বোর্ড দীঘ দিন ধরে অন্য দেশের কাছে ধরনা দিয়েও বিদেশি টিমকে তাদের দেশে আনতে পারছে না। জঙ্গি জঙ্গি বলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে প্রোপাগান্ডা ছাড়ানো হচ্ছে ভবিষ্যতে তা কোথায় গিয়ে ঠেকবে সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সকলেই চান জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধতা এবং জনসচেতনতা কিন্তু কী কথা দিয়ে?

রিয়াদুল হাসান

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা:

● বাংলাদেশে ইসলামিক স্টেট জঙ্গি গোষ্ঠীর অস্তিত্ব আছে, এমন বিষয় স্বীকার করে নিতে আমাদের ওপর প্রচণ্ড চাপ আছে। কিন্তু বিষয়টি স্বীকার করে নিলে বাংলাদেশের অবস্থা সিরিয়া কিংবা পাকিস্তানের মতো হবে এবং বাংলাদেশে ওপর হামলে পড়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হবে। এটা যাতে না হয়, সেজন্যে জাতি হিসেবে সবাইকে সচেতন হতে হবে। (বিবিসি বাংলা ০৮/১১/২০১৫)

সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের ধরিয়ে দেওয়া, আইনের হাতে সোপর্দ করা এবং তাদের উপযুক্ত শাস্তির জন্য প্রত্যেক মানুষের সহযোগিতা লাগবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকেও শক্তিশালী করা হচ্ছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা হলো দেশের মানুষকে সচেতন করা। সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি হলেই দেশকে আরও শান্তিপূর্ণ করা সম্ভব। (দৈনিক প্রথম আলো ১৭/১১/২০১৫)

● সাংবাদিকদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লেখনির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। (দৈনিক সমকাল, ০১/০৭/১৫)

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল:

● শক্তি প্রয়োগ না করে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে গণসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি গোয়েন্দা নজরদারি বাড়ানো হবে। সরকারের প্রচেষ্টার পাশাপাশি গণসচেতনতা সৃষ্টিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করতে হবে। স্কুল-কলেজ, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মসজিদে গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হবে। এ জন্য গণমাধ্যমে প্রচারণা চালানো হবে। (দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ১০/০৪/২০১৪)

● জঙ্গিদের পুরোপুরি প্রতিহত করতে সরকারের সঙ্গে জনগণকেও এগিয়ে আসতে হবে। (লেটেস্ট বিডি নিউজ ১০/১১/২০১৫)

● যে কোনো মূল্যে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ নির্মূল করা হবে। (দৈনিক ইত্তেফাক ১৩/১১/২০১৫)

আই.জি.পি এ কে এম শহীদুল হক:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির সামনে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে চার-পাঁচটি ছেলে দুই-তিনটা মেয়েকে শ্লীলতাহানি করল। যাদের সামনে এই ঘটনা ঘটাল, সেই পাবলিকরা তাদের কেন ধরল না। পাবলিকই তো তাদের শায়েস্তা করতে পারত। প্রত্যেক নাগরিকের আইনগত অধিকার আছে, তাদের সামনে অপরাধ ঘটলে তারাই তাদের গ্রেপ্তার করতে পারবে। এতে পুলিশের গ্রেপ্তার করা লাগত না। (দৈনিক প্রথম আলো- ১৪/০৫/২০১৫)

র‍্যাব মহাপরিচালক বেনজির আহমেদ:

দেশে নতুন করে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। দেশে আইএস এর কোন অস্তিত্ব নেই। সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে একটি গোষ্ঠী আইএস এর অস্তিত্ব আছে বলে অপপ্রচার চালাচ্ছে। (দৈনিক কালের কণ্ঠ ৯/১১/২০১৫)

● দেশের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস নির্মূল করবে র‍্যাব। (দৈনিক যুগান্তর ১৮/০২/২০১৫)

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম:

দেশের চলমান সহিংসতা ও জঙ্গিবাদ দমনে দেশের জনগণের সহযোগিতারও দরকার রয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দেশে জঙ্গিবাদের

উত্থান যাতে রোধ করা যায় তার জন্য সার্বক্ষণিক কাজ করে যাচ্ছে। জঙ্গিবাদ পুরোপুরি নির্মূল করা জনগণের সহযোগিতা ছাড়া সম্ভব নয়। জঙ্গিবাদ রোধে আরেকটি বড় সমস্যা হলো, যারা এসবের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ে তারা এর থেকে আর ফিরে আসতে পারে না। কারণ তারা মনে করে, এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। আর এ কারণেই তাদের অনেকে কারাগার থেকে জামিনে বেরিয়ে পুরনো কাজে ফিরে যায়। তবে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কঠোর আইনেরও প্রয়োজন আছে। (এটিএন- টক শো - নিউজ আওয়ার এক্সট্রা, দৈনিক কালেরকণ্ঠ ৩ মার্চ ২০১৫)

● Terrorism এর পিছনে একটি Ideology থাকে। Ideology-কে Ideology দিয়ে ফাইট করতে হবে। এটাকে বলা হয় War of Ideas। তারা যে Ideology প্রচার করছে যেমন কোর'আনের আয়াত কিম্বা কোন হাদীসের বিকৃত ব্যাখ্যা করে মানুষকে আকৃষ্ট করছে। এটার সঠিক ব্যাখ্যা জানানোর প্রয়োজন রয়েছে। মোদ্দাকথা Awareness একটি বড় ব্যাপার। Awareness এর কাজটা পুলিশ বা Law Enforcing Agency করতে পারলে ভাল হত। কিন্তু অন্যদেরও এগিয়ে আসা দরকার। (টকশো- মাছরাঙা টেলিভিশন, ২৮/০৮/২০১৩)

বিশ্লেষক ও বিশিষ্ট নাগরিক:

● এখন যে সঙ্কট বাংলাদেশের জনগণ মোকাবিলা করছে, তাকে শুধু রাজনৈতিক বললে হবে না। এটাকে আদর্শিকভাবেও মোকাবিলা করতে হবে। (জুলফিকার আলী মানিক, সাংবাদিক, ঢাকা ট্রিবিউন, এটিএন- টক শো - নিউজ আওয়ার এক্সট্রা, দৈনিক কালেরকণ্ঠ ৩ মার্চ ২০১৫)

● এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর ও ফলপ্রসূ উদ্যোগ হবে, উভয় দেশের (পাকিস্তান ও মিয়ানমার) জনগণকে এই জঙ্গিবিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। জঙ্গিরা যাতে ইসলামের নামে সাধারণ মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকে বিপথে পরিচালিত করতে না পারে, সে ব্যাপারে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে উভয় দেশের সরকারকেই। একই সঙ্গে এগিয়ে আসতে হবে সচেতন জনগোষ্ঠীকেও। (দৈনিক কালেরকণ্ঠ সম্পাদকীয় ২২ নভেম্বর ২০১৪)

● দেশে সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদ এতোই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে যে তা বর্তমানে জঙ্গিবাদে রূপ নিয়েছে। এই জঙ্গিবাদ রুখতে বিকল্প হিসেবে জনগণের শক্তি গড়ে তোলার সময় হয়েছে। (রাশেদ খান মেনন, ৮/০৮/২০১৫)

● বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে মতাদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূল অথবা স্থায়িভাবে দমন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সমাজকে এ ধরনের হুমকি থেকে নিরাপদে রাখতে হলে বহুমুখী তৎপরতার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন রয়েছে একটি জাতীয় ঐকমত্য গঠনের এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ভিত্তিতে এই কালো থাবাকে প্রতিহত করা। (ব্রিগেডিয়ার অব. সাখাওয়াত হোসেন, প্রথম আলো, ১২/১১/১৪)

● জঙ্গি সংগঠনগুলোর কু-আদর্শকে পরাজিত করতে হলে সু-আদর্শের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দরকার। (মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.), দৈনিক কালের কণ্ঠ, ২২/০৭/১৫)

● বাংলাদেশের ৮৯-৯০ শতাংশ মানুষ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। তাদের ধর্মীয় আবেগ-অনুভূতির প্রতিও আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অনেকেই রাজনৈতিক বক্তৃতা-বিবৃতিতে অহেতুক ধর্মকে টেনে আনেন, ধর্ম নিয়ে কটূক্তি করতেও দ্বিধা করেন না। এসব বক্তৃতা-বিবৃতিতে যে ধর্মপ্রাণ মানুষ আহত হতে পারেন, তাও মনে রাখেন না। বাংলাদেশের মানুষ ধর্মপ্রাণ হলেও ধর্মান্ধ নন। তবে ধর্মপ্রাণ মানুষ আহত হন এমন কিছু করলে জঙ্গিবাদীরা সেই সুযোগ নিতে পারে (এম সাখাওয়াত হোসেন, দৈনিক যুগান্তর ৪/০৩/২০১৪)।

● বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল হয়েছে, এমন কথা আমরা কখনো বলি নি। যদি কেউ বলে থাকেন, তাঁরা সত্য বলেন নি। কাউন্টার টেররিজম ও অ্যান্টি টেররিজম দুটি আলাদা বিষয়। অ্যান্টি টেরোরিজম বা সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে জঙ্গিদের নির্মূল করা যায়, তাদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেয়া যায়, কিন্তু তাদের যে আদর্শ বা দর্শন জঙ্গিবাদ তা নির্মূল করতে হবে উন্নত রাজনৈতিক আদর্শ দিয়ে (শাহেদুল আলম খান, নিরাপত্তা বিশ্লেষক, দৈনিক প্রথম আলো ২৬/০২/২০১৪)।

প্রিয় পাঠক, উপরিউক্ত মন্তব্যগুলোর মধ্যে খেয়াল করুন কয়েকটি বিষয় বারবার ঘুরে ফিরে এসেছে:
১. শুধু শক্তি দিয়ে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা যাবে না।
২. কারণ জঙ্গিবাদের সঙ্গে ধর্মীয় আবেগ জড়িত।
৩. তাই একে মোকাবেলা করতে একটি সঠিক ধর্মীয় আদর্শ লাগবে।
৪. তা দিয়ে জনগণকে সচেতন/উদ্বুদ্ধ/সম্পৃক্ত করতে হবে।
৫. বাংলাদেশকে জঙ্গিবাদী রাষ্ট্র বানাতে ভেতরে বাইরে ষড়যন্ত্র চলছে।
৬. এর বিরুদ্ধে জাতীয় ঐক্য গঠন করতে হবে।
৭. এই কাজে দেশের সমস্ত জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে।
বলা হচ্ছে যে জনগণকে নিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে এবং এজন্য জনগণকে একটি ধর্মীয় আদর্শ দ্বারাই প্রণোদিত (Motivate) করতে হবে। এই আদর্শটি কোথায় পাওয়া যাবে? এটা কি মাদ্রাসায় শেখানো হয়? এটা কি আলেমদের কাছে আছে? না।
মাদ্রাসায় শেখানো হয় সুরা কেরাত, কোরান-হাদীসের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ, আরবি ব্যাকরণ, মাসলা-মাসায়েল ইত্যাদি। মাদ্রাসায় জীবনমুখী কোনো শিক্ষা না থাকায় বাধ্য হয়ে ধর্মীয় শিক্ষাকেই জীবিকার মাধ্যম হিসাবে তারা গ্রহণ করেন। তাদেরকে ঐ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে প্রায় অন্ধ বানিয়ে রাখা হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ ধারণা না থাকায় জঙ্গিবাদের প্রতি তারা অনেকেই মৌন সমর্থন পোষণ করেন, হয়তো সুযোগের অভাবে যোগদান করতে পারেন না। এক কথায় মাদ্রাসা শিক্ষা থেকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর মতো কোনো শিক্ষা সেখানে নেই, সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থায় তো নেই-ই। সেখানে শুধু একচেটিয়াভাবে জঙ্গিবাদের বিরোধিতা করা হচ্ছে, কিন্তু পাল্টা কোনো আদর্শ সেখানে শেখানো হচ্ছে না। ফলে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ধর্মবিদ্বেষী মনোভাব নিয়ে মানুষ বের হচ্ছে।
আল্লাহ সেই সঠিক ইসলাম যা জঙ্গিবাদসহ ধর্মের নামে চলা যাবতীয় বিকৃতিকে অপনোদন করতে সক্ষম তা দয়া করে হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। সেই যুক্তি তথ্য প্রমাণগুলো উপস্থাপন করে যদি এই জাতির ষোল কোটি মানুষকে সচেতন করে তোলা যায় তাহলে জঙ্গিবাদের সঙ্কট থেকে আমরা রক্ষা পাব ইনশা'আল্লাহ।

এটাই কি 'সভ্যতার সংঘাত' নয়?

মোহাম্মদ আসাদ আলী

আইএস ও জঙ্গিবাদকে কেন্দ্র করে যে বৈশ্বিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির সাবেক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটনের 'Clash of civilization' তত্ত্ব। সারা পৃথিবী দাপিয়ে বেড়ানো পশ্চিমা বস্তুবাদী সভ্যতার সাথে ইসলাম বা মুসলিম সভ্যতার সংঘাত এখন স্পষ্ট। যদিও এ সংঘাত অনেক পুরোনো, তবে এতদিন তা ভেতরে ভেতরে ক্রিয়াশীল ছিল। এখন তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে উঠছে।
জঙ্গিবাদকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যে ইসলামোফোবিয়া মাত্রাতিরিক্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ৯/১১ এর হামলার পর পশ্চিমা মিডিয়ায় ইসলামের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রকাশ্যে সমালোচনা হতো, ইসলামকে সন্ত্রাসী ধর্ম, সন্ত্রাসের স্রষ্টা, আশ্রয় ও প্রশ্রয়দাতা বলে উল্লেখ করা হতো এখনকার অবস্থা অনেকটা তেমন। ইউরোপ-আমেরিকায় এমনিতেই মুসলিমদের সামাজিকভাবে হেয় করা হয়ে থাকে। আর এখন শুধু হেয় নয়, রীতিমতো তাদের নিরাপত্তার হুমকি তৈরি হয়েছে। এই সেদিনও অস্ট্রেলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী টনি অ্যাবোট বললেন- "ইসলামের মধ্যে মারাত্মক সমস্যা আছে।" বিদ্বেষবশত ইসলামের মধ্যে সমস্যা দেখছেন অনেকেই। অবস্থাভেদে কেউ প্রকাশ করছেন কেউ করছেন না। যারা প্রকাশ করেছেন তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান দলের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনের মনোনয়নপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য প্রদান করে সারা পৃথিবীতে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। তিনি সাফ সাফ জানিয়ে দেন, 'যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিমদের প্রবেশের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হোক।' এখানে জেনে রাখা দরকার, তিনি এই মুসলিমবিদ্বেষী বক্তব্য রেখেছেন নির্বাচনী প্রচারে। নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সাধারণত

একজন প্রার্থী কী ধরনের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেন? অবশ্যই ওই এলাকার জনসাধারণের মানসিকতার উপযোগী বক্তব্য, যা প্রার্থীর প্রতি ভোটারদের আকৃষ্ট করবে। সে অর্থে ডোনাল্ড ট্রাম্প- এর ওই মন্তব্যকে যুক্তরাষ্ট্রের অমুসলিম সম্প্রদায়ের মুসলিমবিদ্বেষী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ বলাটাও অযৌক্তিক হয় না। বাস্তবেই তাই হয়েছে। জানা গেছে ওই মন্তব্যের পর রাতারাতি তিনি জনপ্রিয়তার নতুন মাত্রা লাভ করেছেন। এখন বলা হচ্ছে যদি তাকে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে মনোনয়ন না-ও দেয়া হয় তিনি স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচন করলেও জয়ী হবার সম্ভাবনা অনেক বেশি। দেশটিতে মুসলিমবিদ্বেষ কতদূর গড়িয়েছে তার নমুনা এটা। হয়তো এ কারণেই যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব জঙ্গিবাদ দমনের অজুহাতে মুসলিম দেশগুলোকে ধ্বংস্তূপে পরিণত করার সাহস পায়। ইসলামবিদ্বেষের ফুয়েল খরচ করে চলে সাম্রাজ্যবাদের ইঞ্জিন।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এক বক্তৃতায় বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্রের চরমপন্থার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ইসলামের বিরুদ্ধে নয়। আইএস চাচ্ছে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আমেরিকা ও ইসলামের মধ্যকার লড়াই হিসেবে চিত্রিত করতে। তেমনটা মনে করা অনুচিত হবে।' প্রশ্ন হচ্ছে, বারাক ওবামার ভাষণে এ প্রসঙ্গ আসবে কেন? কেনই বা মুসলিমরা মনে করতে যাবে যুক্তরাষ্ট্র বা পাশ্চাত্য শক্তিগুলো সন্ত্রাসের নাম করে আসলে ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে? বস্তুত জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বা 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে'র (war on terror) নাম করে বর্তমানে যা চলছে ও অতীতে যা হয়েছে সে প্রেক্ষাপটই এমন সন্দেহের জন্ম দিয়েছে, এবং এ প্রশ্নের হালে পানি রয়েছে বলেই, প্রশ্নটি অতি বাস্তবসম্মত বলেই বিশ্বের অন্যতম পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট তার সমাধান দেয়ার প্রয়োজনবোধ করেছেন। সবাইকে আশ্বস্ত করেছেন। কিন্তু তার মনোভাব অন্তত যেটা তিনি মুখে প্রকাশ করেছেন তার সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সাধারণ নাগরিকদের কতটুকু মতের মিল আছে সে প্রশ্ন থেকেই যায়।

এ গেলো ইসলাম ও মুসলিম জাতির ব্যাপারে ইউরোপ-আমেরিকার দৃষ্টিভঙ্গি। এবার জানা যাক মুসলিম বিশ্ব ইউরোপ-আমেরিকাকে কী দৃষ্টিতে দেখছে।

মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন চলছে একবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। ঘটনাক্রমে তার তীব্রতা আরও বাড়ছে। ফলে বাড়ছে পশ্চিমাবিরোধী গণঅসন্তোষ। আর সে অসন্তোষের আগুনে ঘি ঢালছে জঙ্গিরা। খেলাফতের দাবিদার আই.এস পশ্চিমাদের 'ক্রুসেডার' আখ্যা দিয়ে তাদের ভাষায় জিহাদ ঘোষণা করেছে। তারা সারা বিশ্বের মুসলিমদের আহ্বান জানাচ্ছে আইএসের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কথিত জিহাদে শামিল হতে। ক্রুসেডারদের (পশ্চিমা খ্রিস্টানদের) হত্যা করে তারা চলতি শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ মুসলিম নর-নারী হত্যার বদলা নিতে চায়। এসব আহ্বান শুনে মুসলিম বিশ্বের অনেক তরুণ-তরুণী ছুটে যাচ্ছে সিরিয়ায়, ইরাকে। আইএস আদতে কাদের তৈরি, কার স্বার্থ রক্ষা করছে- সেসব ভাবনা চিন্তা করারও প্রয়োজনবোধ করছে না তারা। এছাড়া প্রায় সব মুসলিম দেশেই আইএসের অনেক সমর্থক আছে যারা বিভিন্ন বাধা-প্রতিবন্ধকতার কারণে কথিত জিহাদে শামিল হতে পারছে না হয়তো, তবে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে জিহাদে ভবিষ্যতে সম্পৃক্ত হবে এ বাসনা বুকে ধরে আছে।

ইরাক আগ্রাসনের পূর্বে জর্জ বুশের মুখে উচ্চারিত 'ক্রুসেড' শব্দটা কিন্তু আজও ১৬০ কোটি মুসলমানের কানে বাজে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ক্রুসেড হয় না, যুদ্ধ হয়। ক্রুসেড হয় ইসলামের বিরুদ্ধে বা মুসলিমদের বিরুদ্ধে। কার্যত ইরাক হামলার পরিণতির দিকে তাকালে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের ওই হামলায় সন্ত্রাসের ক্ষতি হয় নি, হয়েছে মুসলিমদের, ইসলামের। অর্থাৎ সেটা আদতেই ক্রুসেড ছিল। আফগানিস্তান হামলার সময় ক্রুসেডের ঘোষণা দেওয়া হয় নি, কিন্তু সেখানেও যা ঘটেছে এবং ওই হামলার পরিণতি যেখানে দাঁড়িয়েছে তার ধকল সহ্য করতে হচ্ছে মুসলিমদেরকেই। তালেবান-আল কায়েদার একটা পশমও ছিঁড়তে পারে নি কেউ। একইভাবে লিবিয়ায় মানবাধিকারের ধুয়া তুলে বিমান হামলা চালিয়ে একটা প্রতিষ্ঠিত সরকারকে উৎখাত করা হলো। এখন দেশটিতে বলতে গেলে কোনো সরকার নেই, কর্তৃপক্ষ নেই, বিস্তৃত এলাকা দখলে রেখেছে জঙ্গিরা। আর তাদের কাছ থেকে অবৈধভাবে তেল কিনছে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রগুলো। পশ্চিমারাও সেখানে নিজেদের স্বার্থ ঠিক খুঁজে নিয়েছে। অথচ এখন তাদের মিডিয়ায় খবর বেরোয়- গাদ্দাফি ছিল আফ্রিকার ত্রাতা। এর চেয়ে হাস্যকর আর কী হতে পারে। লিবিয়ার অধিবাসীরা জেনেছে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ কী জিনিস। ইরাক-সিরিয়ার আজকের পরিণতির জন্য, আইএসের উত্থানের জন্য কারা দায়ী? আর তার পরিণতি ভোগ করছে কারা? সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মুসলিম বিশ্ব।

একদিকে আইএসের বর্বরতা, অন্যদিকে পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া যুদ্ধ- উভয়ে মিলে যে নরকরাজ্য তৈরি করেছে ইরাক-সিরিয়ায়, তা থেকে পালিয়ে মুসলিমরা যখন ইউরোপে বা আমেরিকায় আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করছে, তখন মানবতাবাদীদের ঘুম হারাম হবার উপক্রম হয়েছে। গণতন্ত্রের প্রবক্তরা, অসাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতার ধ্বজাধারীরা দাবি তুলছেন- নিরাপত্তার কারণে মুসলিম প্রবেশ নিষিদ্ধ হোক।

ক্রুসেডের নামে ইউরোপীয় মধ্যযুগে খ্রিষ্টান ধর্মব্যবসায়ীদের চালানো দুইশ' বছরের অযাচিত যুদ্ধের ইতিহাস মুসলিমরা ভুলে যায় নি। ইউরোপের বর্তমান মুসলিমবিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতিমালা, দুঃসহ সামাজিক বৈষম্য বা বর্ণবাদ, ইসলামবিদ্বেষী অবাধ সাহিত্য-ম্যাগাজিন, কার্টুন, মুভি ইত্যাদি ইউরোপ-আমেরিকার মুসলিমবিদ্বেষের প্রতীক হয়ে আছে এখনও। এসব করা হচ্ছে মুসলিমদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে নয়। ফলে মুসলিম বিশ্বের যারা আইএসের কাছে যাচ্ছে তারা তো যাচ্ছেই, যারা আইএসকে সমর্থন করে না, তারাও যে পশ্চিমাদের ভালো দৃষ্টিতে দেখছে তা কিন্তু নয়। পাশ্চাত্যের বিরুদ্ধে তাদেরও পুঞ্জীভূত ক্ষোভ কম নয়।

এভাবে ইউরোপ-আমেরিকার ভুল পররাষ্ট্রনীতি, আধিপত্যবাদ, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ধর্মের অপব্যবহার, পরিকল্পিতভাবে জঙ্গিবাদের উত্থান ও প্রসার ঘটানো এবং মুসলিম বিশ্বের ধর্মবিশ্বাসকে সঠিক খাতে প্রবাহিত করার ব্যর্থতা যে পরিণতির দিকে গড়াচ্ছে তাকে 'সভ্যতার সংঘাত' (Clash of civilization) হিসেবে চিহ্নিত করাটা অসমীচীন হবে কি?

জঙ্গিদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থায় জঙ্গিবাদ আরো বেড়েছে -জাতিসংঘ মহাসচিব

আন্তর্জাতিক ডেস্ক:

জাতিসংঘের মহাসচিব বান কি মুন ইসলামিক স্টেটের (আইএস) মতো জঙ্গিবাদী সংগঠনকে রুখতে মানবাধিকার লঙ্ঘন না করার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, কঠোর পন্থা নেওয়ার ফলে জঙ্গিবাদ বরং বেড়ে গেছে। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গত ১৫ই জানুয়ারি বিশ্বের দেশগুলোর প্রতি এই আহ্বান জানিয়ে একটি কর্মপরিকল্পনা তুলে ধরেন তিনি।

বান কি মুন প্রতিটি রাষ্ট্রকে জঙ্গিবাদ নির্মূলে একটি জাতীয় পরিকল্পনা তৈরির আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আইএস বা অন্যান্য জঙ্গিগোষ্ঠীর হুমকি মোকাবিলায় এখন সংকীর্ণ পরিসরে কেবল সামরিক ও নিরাপত্তাগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এদের মোকাবিলা করতে হলে এসব পন্থার বাইরে এসে পরিকল্পনা করতে হবে। বান কি মুন বলেন, অপরিকল্পিত নীতি, ব্যর্থ নেতৃত্ব, কঠোর পন্থা, কেবল বল প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূলের চেষ্টা হয়েছে। উপেক্ষিত হয়েছে মানবাধিকার। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, এসব পন্থা নেওয়ার ফলে জঙ্গিবাদ বরং বেড়েই গেছে।

জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, "ভুল নীতির ফলে আমরা নিষ্ঠুর জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে হেরে চলেছি। এ ধরনের নীতি মানুষের বিরুদ্ধে মানুষকে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। কোণঠাসা হওয়া মানুষ দিন দিন আরও কোণঠাসা হয়ে পড়ছে। আর এর ফলে শত্রুদের হাতই শুধু শক্তিশালী হচ্ছে।" বান কি-মুন বলেন, "আমাদের মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে এবং সাধারণ জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে।" তিনি আরও বলেন, "সন্ত্রাসবাদ বা জঙ্গিবাদের একপেশে ব্যাখ্যা দিয়ে প্রায়ই বিরোধী পক্ষ, সুশীল সমাজের সংগঠন বা মানবাধিকারকর্মীদের কর্মকাণ্ডকে অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। কারও মুখ বন্ধ করতে বা কাউকে বাধা দিতে কোনো সরকারেরই এ ধরনের আচরণ করা উচিত নয়। জঙ্গিবাদ সব সময়ই এ ধরনের পরিস্থিতির সুযোগ নেয়। আমরা যেন সেই ফাঁদে পা না দিই।"

জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, "জঙ্গিবাদের হুমকি মোকাবিলায় আইনগত অধিকার আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের রয়েছে। তবে এই সন্ত্রাসবাদের কারণ নির্ণয়েও আমাদের দৃষ্টি দিতে হবে।"

তিনি জঙ্গিবাদ নির্মূলে ৭৯ দফা সুপারিশ করেন। এর মধ্যে অন্যতম হলো, যেসব বিদেশি ইতোমধ্যে আইএসের মতো জঙ্গি সংগঠনে যোগ দিতে গেছে, তাদের শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ দিয়ে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। মানবাধিকার সমুন্নত রাখতে শিক্ষার প্রসারের তাগিদ দেন বান কি মুন। তিনি বলেন, এর ফলে আইএস বা বোকো হারামের মতো জঙ্গি সংগঠনগুলো তরুণদেরকে তাদের দলে ভেড়ানোর চেষ্টা বন্ধ করবে।

পশ্চিমে ধর্মনিরপেক্ষ ব্যবস্থা গৃহীত হলো প্রাচ্যে কেন হচ্ছে না?

রিয়াদুল হাসান

সব মতবাদের মতো গণতন্ত্রেরও জোয়ার-ভাটা আছে। কখনো দুনিয়াজুড়ে এর ঢেউ আছড়ে পড়ে, আবার সেই পর্ব শেষ হলে গণতন্ত্রে আসে ভাটার টান। আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তার 'দ্য থার্ড ওয়েভ: ডেমোক্রেটাইজেশন ইন দ্য লেট টোয়েন্টিয়েথ সেঞ্চুরি' বইয়ে আধুনিক বিশ্বে গণতন্ত্রের তিনটি জোয়ারের সময়ের কথা বলেছেন। এই জোয়ারগুলোর মাঝে ভাটার পর্ব গেছে। বাংলাদেশও গণতন্ত্রের এসব জোয়ার-ভাটার বাইরে নয়।

তিনি লিখেছেন, আধুনিক গণতন্ত্রের যে যাত্রা, তা তিনটি পর্ব বা ঢেউয়ের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। গণতন্ত্রের প্রথম ঢেউটি ছিল ১৮২৮ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত। প্রায় ১০০ বছরের দীর্ঘ এই জোয়ারের সময় যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্সসহ বিশ্বের ২৯টি দেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৯২০ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত ২০ বছর ভাটার সময় গেছে গণতন্ত্রে। তখন কোথাও ফ্যাসিজমের বিকাশ হয়েছে, কোথাও কোথাও কমিউনিজম। গণতন্ত্রের দ্বিতীয় জোয়ার শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যৌথ বাহিনীর বিজয়ের পর। বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৬। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বিশ্ব গণতন্ত্রে আবার চলে ভাটার টান। সাবেক ঔপনিবেশিক দেশগুলোতে জোরদার হয়ে ওঠে কর্তৃত্ববাদী শাসন। গণতন্ত্রের শেষ জোয়ারটি বয়ে গেছে ১৯৭৪ থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত, এ সময়ে দক্ষিণ ইউরোপ, দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও বিভিন্ন কমিউনিস্ট দেশে গণতন্ত্রের বিকাশ ঘটে। ১৯৯৪ সাল নাগাদ বিশ্বে গণতান্ত্রিক দেশের সংখ্যা দাঁড়ায় ৭২। এরপর থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত গণতন্ত্র অবলম্বনকারী রাষ্ট্রের সংখ্যা বেড়ে ১২৫ এ দাঁড়িয়েছে। কিন্তু এখন প্রশ্ন দাঁড়িয়েছে সংখ্যার নয় মানের। অন্যান্য সকল জীবনব্যবস্থা বা মতবাদের মতোই গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও সরকারগুলো কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠেছে যা গণতন্ত্রের তত্ত্বের পরিপন্থী।

সমাজের সবকিছুর ওপর সরকারগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ কঠোর থেকে কঠোরতর করে যাচ্ছে। ফলে গণতন্ত্রের নামে বিশ্বময় শুরু হয়েছে জবরদস্তিমূলক শাসন যা কম্যুনিজমের নামে জনতার উপর ফ্যাসিজমের স্টিম রোলার চালানোর স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এখন গণতন্ত্র যদি অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও নিরাপত্তাকে নিশ্চিত করতে না পারে তাহলে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধেই গণঅভ্যুত্থান হবে। যার উদাহরণ হচ্ছে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে সরাতে ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে থাই জনগণের রাস্তায় নেমে আসা।

সমাজের সবকিছুর ওপর সরকারগুলো তাদের নিয়ন্ত্রণ কঠোর থেকে কঠোরতর করে যাচ্ছে। ফলে গণতন্ত্রের নামে বিশ্বময় শুরু হয়েছে জবরদস্তিমূলক শাসন যা কম্যুনিজমের নামে জনতার উপর ফ্যাসিজমের স্টিম রোলার চালানোর স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

মিসরের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। সেখানে বৈধভাবে নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয়েছে পশ্চিমা সমর্থিত সামরিক অভ্যুত্থানে এবং সেখানকার জনগণের একটি বড় অংশ তাকে সমর্থন জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা পশ্চিমা বিশ্ব যে গণতন্ত্রের অবতার এমন ধারণা মায়ানমারে সামরিক শাসন উৎখাতের ঘটনা দেখে অনেকে মনে করতে পারেন, কিন্তু তাদের ভুল ধারণা ভেঙ্গে যাবে মিসরের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে সামরিক শাসন কায়েমের পক্ষে পশ্চিমাদের জোরালো অবস্থান গ্রহণের ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করলে। স্যামুয়েল হান্টিংটন এ ধরনের প্রবণতা সম্পর্কে

বলেছেন, 'নতুন গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে কখনো 'ওপর' থেকে চাপিয়ে দেওয়া গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং অভিজাতদের চাপেই এমনটা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, অনেক দেশই এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ধারণ করতে প্রস্তুত নয়।'

প্রাচ্যের মানুষও তেমনি প্রস্তুত নয় সেটা গ্রহণ করতে যদিও সরকারগুলো চেষ্টা করে যাচ্ছে। এখন এই প্রস্তুত না থাকার কারণটা হৃদয় দিয়ে বোঝা নীতি নির্ধারকদের জন্য খুবই জরুরি। অন্যথায় আমরা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র নামক মরীচিকার পেছনে ঘুরে ঘুরে আরো অনেক সময় নষ্ট করে ফেলব। সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অত সময় নেই আমাদের হাতে। এই কারণগুলো নিয়ে কয়েকটি সূত্রকথা আমরা এখন আলোচনা করব।

১. ব্যবস্থাটি মানুষের হৃদয়ের অনুকূল ও যুগের দাবি হতে হবে:

সমাজব্যবস্থা ও সভ্যতা সম্পর্কে একটি সরল সূত্র আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। তা হচ্ছে সভ্যতার ভিত্তিটি স্থাপন করতে হয় মানুষের হৃদয়ে। মানুষ যদি কোনো জীবনব্যবস্থাকে, সংস্কৃতিকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করে নেয় তাহলে সেটি তাদের স্বতঃস্ফূর্ত চর্চার মাধ্যমে এক সময় সভ্যতার রূপ নেয়। যদি কোনো সভ্যতাকে 'ওপর' থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয় তাহলে সেটা ক্ষমতা ও বলপূর্বক শাসন করতে পারে তবে সেটা স্থায়ী হয় না, সভ্যতায় রূপ নিতে পারে না। কিছুদিন পরেই তা আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। ধর্মগুলো হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের হৃদয়ে আসন গেঁড়ে আছে, সেগুলো সভ্যতার রূপ নিয়েছে। তাই একমাত্র পাশ্চাত্য ধর্মহীন সভ্যতাটি ছাড়া অতীতের সবগুলো সভ্যতাই ধর্মভিত্তিক সভ্যতা। তবে ধর্মও যদি চাপিয়ে দেওয়া হয় সেটা গৃহীত হয় না, যার উদাহরণ বাদশাহ আকবরের দীনে এলাহী ও আফগানিস্তানের তালেবান ইত্যাদি।

ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে এসে শাসনক্ষমতা দখল করে এবং তাদের নিজেদের দেশে যা চালিয়ে অভ্যস্ত সেই ধর্মনিরপেক্ষ (ধর্মহীন) রাষ্ট্রব্যবস্থা এখানেও প্রচলন করে। অর্থাৎ তারা ভারতবর্ষে সুপ্রতিষ্ঠিত একটি সভ্যতার উপরে আরেকটি অসামঞ্জস্যশীল সভ্যতার মূল্যবোধ ও বিধিবিধান চাপিয়ে দেয়। পূর্বতন সভ্যতাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল হিন্দু, মুসলিম ও বৌদ্ধ ধর্মের দর্শন ও জীবনব্যবস্থার ভিত্তিতে, অর্থাৎ এর ভিত্তি ছিল মানুষের মর্মমূলে যেখানে তাদের ধর্মবিশ্বাস সেখানে। কথা হচ্ছে, ভারতবর্ষের মানুষ কি সেই ধর্মভিত্তিক (যদিও তা ত্রুটিহীন ছিল না) ব্যবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য ত্রাহিসুরে চিৎকার করছিল? তারা কি খারাপ ছিল খুব? না। তারা সেই বিধানের মধ্যে বেশ ভালোই ছিল। টাকায় আট মণ চাল, গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু এই কথাগুলো সেই সোনালি অতীতের গর্ভেই জন্ম নিয়েছিল। অন্তত এমন কোনো পরিবেশ সৃষ্টি হয় নি যে মানুষ তার রাষ্ট্রীয় জীবনে, সামগ্রিক জীবনে ধর্মকে প্রত্যাখ্যান করে ধর্মনিরপেক্ষ হয়ে যাবে।

২. ইউরোপে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ছিল যুগের দাবি:

ইউরোপ কেন ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) জীবনবিধানের দিকে ঝুঁকলো তা প্রাসঙ্গিক কারণে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। এটা ছিল দীর্ঘ ১,৫০০ বছরে সৃষ্ট প্রেক্ষাপট ও অজস্র মর্মবিদারী ঘটনাপ্রবাহের ফল। খ্রিষ্টধর্মে জাতীয় জীবনব্যবস্থা না থাকা সত্ত্বেও গীর্জার বানোয়াট ধর্মকে জাতীয় জীবনে চালাতে গিয়ে মধ্যযুগে চরম মানবিক বিপর্যয়, সহিংসতা,

মধ্যযুগে চরম মানবিক বিপর্যয়, সহিংসতা, অরাজকতা, বর্বরতা ও জাহেলিয়াতে ঢেকে যায় ইউরোপ তথা খ্রিষ্টান জগৎ। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানিরা যেমন- কোপারনিকাস, ব্রুনো, গ্যালিলিও এ তিন বিজ্ঞানী সত্য আবিষ্কার ও তা প্রচারের জন্য স্বৈরাচারী চার্চের কোপানলে পতিত হয়। ব্রুনোকে ১৬০০ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী হাত-পা বেধে আগুনে নিক্ষেপ করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করা হয়। এছাড়াও স্পেনের মনীষী মাইকেল সারভেন্টাস(১৫১১-১৫৫৩)কে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। কারণ তিনি গডের ত্রিতত্ত্ববাদ বিশ্বাস করার কোন যৌক্তিক কারন খুঁজে পাননি এবং যিশুর খোদা পুত্র হবার কোন কারণ না খুঁজে পাবার জন্য।

অরাজকতা, বর্বরতা ও জাহেলিয়াতে ঢেকে যায় ইউরোপ তথা খ্রিষ্টান জগৎ। জনগণের আত্মা রাজা ও গীর্জার পেষণে পড়ে মুক্তির জন্য ত্রাহি চিৎকার করতে থাকে। এই দুঃসহ পরিস্থিতি থেকে মানুষকে মুক্তি দেওয়ার জন্য রাজাকে গীর্জার উপরে ক্ষমতাবান করে ১৫৩৭ সনে নতুন একটি ব্যবস্থার পত্তন ঘটানো হয় ব্রিটেনে। এখানে রাজা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে ধর্মের কর্তৃত্ব ও বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যান। ধর্ম নির্বাসিত হয় হিতোপদেশ, পরকাল, প্রার্থনা ইত্যাদি বিষয়ের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ জীবনব্যবস্থাটির আবির্ভাব ইউরোপে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয় বরং তাদের ঐকান্তিক ইচ্ছার প্রতিফলন ছিল যা তাদের হিসাবে 'ইউরোপের আধুনিক যুগের' সূচনা করেছিল। কোনো ধর্মভিত্তিক জীবনব্যবস্থা না থাকায় তাদের সামনে এ ছাড়া কোনো বিকল্প ছিল না। কিন্তু ভারতবর্ষে তা ছিল 'ওপর' থেকে চাপিয়ে দেওয়া, নিজেদের জীবনব্যবস্থার সংকটের দরুন নয়।

৩. ঔপনিবেশিক যুগে ধর্ম নির্মূলের চেষ্টা নয়, রাজনৈতিক অপব্যবহার করা হয়েছে:

ধর্মকে ব্রিটিশরাজ কিন্তু ভারতবর্ষ থেকে একেবারে নির্মূল করতে চায় নি, তারা কেবল ধর্মকে তাদের শাসননীতির হাতিয়ারে পরিণত করেছিল। তারা মাদ্রাসা শিক্ষার মাধ্যমে মুসলিমদেরকে চরম মূর্খতা ও অন্ধত্বের মধ্যে নিপতিত করে রাখতে চেয়েছিল এবং হিন্দুদেরকে পাশ্চাত্য ইংরেজি শিক্ষা দিয়ে নিজেদের অনুগত কেরানি, আর্দালি, দফতরি তথা চাকরিজীবী চাকরে পরিণত করতে চেয়েছিল। তারা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে নানা ফন্দিতে পূর্বতন শাসক মুসলিমদেরকে হিন্দুদের (সনাতন) থেকে একশত বছর পিছিয়ে দেয়। ১৮১৭ সনে হিন্দুদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য হিন্দু কলেজ (প্রেসিডেন্সি কলেজ) প্রতিষ্ঠা করা হয়, ১৮২৪ সনে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয় কিন্তু সেগুলোতে মুসলিমদের প্রবেশাধিকার ছিল না। বহু রক্তের বিনিময়ে, বহু সংগ্রামের পরে ব্রিটিশ যুগে মুসলিমরা নিজেদের শিক্ষালাভের অধিকার প্রাপ্ত হয়। সিপাহী বিদ্রোহেরও ১৮ বছর পর ১৮৭৫ সনে মুসলিমদের জন্য প্রথম কলেজটি স্থাপিত হয় উত্তর প্রদেশের আলীগড়ে। কলকাতায় নারীদের জন্য প্রথম শিক্ষালয়টি নির্মিত হয় ১৮৫০ সনে বেথুন স্কুল কিন্তু সেখানে মুসলিম নারীদের শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল অপ্রতুল। এর ৮৯ বছর পর দেশবিভাগের কিছুদিন আগে ১৯৩৯ সানে লেডি ব্রেবোর্ন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে মুসলিম নারীরা শিক্ষালাভের মোটামুটি সুযোগ লাভ করেন। ধর্মান্ধতার দরুন হিন্দু-মুসলিম উভয় সমাজ নারী শিক্ষার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকায় উপমহাদেশের নারীরা শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়েছিল দারুণভাবে।

মুসলিমদের একটি মহান সুখকর স্বর্ণোজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ অতীতকাল আছে। জীবনের প্রতিটি শাখায় তারাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছিল এ কথা মুসলিমরা ভুলবে কী করে? তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস যতদিন থাকবে, আবার সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার জন্য আকুলতা তাদের কিছু অংশের মধ্যে হলেও ক্রিয়াশীল থাকবে। তারা বিদ্রোহ করবেই।

৪. খ্রিষ্টধর্মের ব্যর্থতা বনাম সনাতন - ইসলাম ধর্মের সফলতার ইতিহাস:

যাদের অতীত আছে তাদের ভবিষ্যৎও আছে। খ্রিষ্টানদের অতীত বলে কিছু ছিল না কারণ ঈসা (আ.) এর দ্বারা কোনো স্বর্ণযুগ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। ইহুদি ধর্মব্যবসায়ীদের প্রবল বাধার কারণে তাঁর শিক্ষা বিকশিত হতে পারে নি, ফলে তাঁর মিশন অসমাপ্ত থেকে যায়। তিনি তিনবছর তওহীদ প্রচারের পর আল্লাহর সান্নিধ্যে গমন করেন। তাঁর অনুসারীরাও ব্যর্থ হন, স্বভাবতই। সুতরাং খ্রিষ্টান ধর্মের কোনো অতীত গৌরব নেই, তাই তারা সহজেই জাতীয় জীবন থেকে ধর্মকে পরিত্যাগ করতে পেরেছে। ধর্মের সংস্কার করে, জাতির মধ্যে পুনর্জাগরণ সৃষ্টি করে ধর্মের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করার কোনো প্রয়াস তারা করতে পারে নি, কেননা অতীত থেকে কোনো উদাহরণ তাদেরকে সেই প্রেরণা যোগায় নি। তবে ভবিষ্যতে ঈসা (আ.) দ্বিতীয়বার এসে বিশ্বময় শান্তি (The Kingdom of Heaven) প্রতিষ্ঠা করবেন এমন বিশ্বাস খ্রিষ্টানরা যেমন পোষণ করে, মুসলিমরাও পোষণ করে। সনাতন ধর্মাবলম্বীরাও বিশ্বাস করে যে আবার সত্যযুগ প্রতিষ্ঠিত হবে, রামরাজত্বের শান্তি আবার ফিরে আসবে এবং তারাই বিশ্বের উপরে কর্তৃত্বশীল হবে। কিন্তু বিশ্বাস করলে কী হবে, ভবিষ্যতের একটি বিষয়কে নিয়ে যত রাজনীতিই করা হোক, যত ক্রুসেডই বাঁধানো হোক, সেটার ভিত্তিতে রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মুসলিমদের একটি মহান সুখকর স্বর্ণোজ্জ্বল, শ্রেষ্ঠত্বপূর্ণ অতীতকাল আছে। জীবনের প্রতিটি শাখায় তারাই বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ছিল এ কথা মুসলিমরা ভুলবে কী করে? তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস যতদিন থাকবে, আবার সেই সোনালি দিন ফিরিয়ে আনার জন্য আকুলতা তাদের কিছু অংশের মধ্যে হলেও ক্রিয়াশীল থাকবে। তারা বিদ্রোহ করবেই। সনাতন ধর্মাবলম্বীদের ধর্মগ্রন্থেও আছে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর যুগে শাস্ত্রের শাসনে সৃষ্টি হওয়া সুবিচার, নিরাপত্তা, প্রাচুর্য আর শান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। কিন্তু সেটা ছিল সুদূর অতীত, আর মুসলিমদের স্বর্ণময় ইতিহাসটা তখনও তরতাজা, হারানোর শোকটাও অমলিন।

৫. ব্রিটিশ রাষ্ট্রনীতি প্রযুক্ত ধর্মান্ধতা, সংশয়বাদ ও সাম্প্রদায়িকতার আবাদ ধর্মনিরপেক্ষতা চর্চার প্রতিবন্ধক:

ব্রিটিশরা মুসলিমদের এই চেতনাটিকে মেরে ফেলার জন্যই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাদ্রাসার মাধ্যমে তারা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। পাশাপাশি সনাতন ধর্মীদের মধ্যেও বিস্তার ঘটিয়েছিল মুসলিম বিদ্বেষী মনোভাব। ১২০০ বছর ধরে (মুহাম্মদ বিন কাশেম থেকে টিপু সুলতান পর্যন্ত) ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলিম সহাবস্থান ছিল শান্তিপূর্ণ, কিন্তু ব্রিটিশদের কূটনীতির কারণে জন্ম নেয় সাম্প্রদায়িকতার শকুন যা ধর্মীয় দাঙ্গা বাঁধিয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলিমের শব ভক্ষণ করেছে।

ব্রিটিশ আসার আগে ভারতে সাম্প্রদায়িক কোনো দাঙ্গা হয় নি এটা এক ঐতিহাসিক সত্য। এমনকি ব্রিটিশের আগে ভারতবর্ষ 'হিন্দু-মুসলিমের' এলাকা হিসেবে পরিচিত ছিল না। ইউরোপে যখন জাতিরাষ্ট্রের ধারণা বিকাশমান, তখন ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের গোড়াপত্তন করে। ভারতবর্ষ হিন্দু ও মুসলমান, এই দুই বৈরী সত্তায় বিভাজিত, এটা উপনিবেশবাদী ইংরেজের প্রচারিত মত।

ব্রিটিশ এর সূত্র ধরে শেষ দাবার চালটা দিয়েছে ধর্মের ভিত্তিতে দেশবিভাগ ঘটিয়ে। সেই কুফল আজও আমরা বয়ে বেড়াচ্ছি। যতই ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা করা হোক, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা মোটেও বিদূরিত হয় নি, কেবল আত্মকেন্দ্রিকতার দরুন তা কিছুদিন চাপা পড়ে থাকে, আবার স্বার্থবাজ রাজনীতিবিদরা ভোটের জন্য সেই নিভু নিভু আগুনকে উস্কে দেয়। সাম্প্রদায়িকতার জন্ম ও প্রতিপালন করে যে বিষবৃক্ষটি ব্রিটিশরা ভারতবর্ষের মাটিতে বড় করে রেখে গেছে, সেই বৃক্ষ থেকে পরধর্মসহিষ্ণুতা, ধর্মনিরপেক্ষতা আশা করা কেবল ব্রিটিশদের যারা পদলেহনকারী চাটুকার তাদের পক্ষেই সম্ভব। যারা নিজেদের স্বাধীনতার ইতিহাস ভুলে যায়, আজীবন দাস থাকা তাদের পক্ষেই সম্ভব।

যেটা বলছিলাম, ব্রিটিশরা কিন্তু ভারতবাসীকে ধর্ম ভোলাতে চায় নি, কারণ চাইলেও সেটা পারতো না। কারণ পাশ্চাত্যের সমাজবিজ্ঞানীরাই প্রাচ্যের সমাজের নাম রেখেছে বিশ্বাসভিত্তিক সমাজ (Faith-based society)। এখানে মানুষের ধর্মবিশ্বাসের মূল এত গভীরে প্রোথিত যে এর মূলোৎপাটন করা অসম্ভব। কাজেই ধুরন্ধর ব্রিটিশরা চেয়েছে দুটি বিপরীতমুখী শিক্ষাব্যবস্থার দ্বারা জাতিকে দ্বিধাগ্রস্ত, বিভক্ত করে ফেলতে। তারা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে হিন্দু ও মুসলিম বিভাজন সৃষ্টি করে গেছে। ধর্মের নামে অধর্মের শেকড় এ জাতির চেতনার গভীরে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছে। ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম হয়েছে সেখানেও ধর্মীয় মৌলবাদকে অবলম্বন করেছে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়। এখন গণতন্ত্রের যিকির যতই করা হোক লাভ নেই। ১২৮ বছরের ধর্মনিরপেক্ষ কংগ্রেস তাই ব্যর্থ হয়ে ধর্মভিত্তিক বিজেপি এখন ভারতের ক্ষমতায়। ফলে হিন্দু মৌলবাদী দলগুলো হিন্দুত্ববাদের জাগরণের চেষ্টা করছে, যার মূল সুরই হচ্ছে মুসলিম বিদ্বেষ।

সনাতন ধর্মেরও আছে সোনালি অতীত, সত্যযুগের ইতিহাস, সমৃদ্ধ সংস্কৃতি। অবশ্য সব ধর্মের মতো সেখানেও কুসংস্কারের দূষণ আছে, তথাপি তারা ইউরোপের মতো দেউলিয়া না। তাদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে যাতে জাতীয় জীবন পরিচালনার জন্য দিক-নির্দেশনা, বিধি বিধান আছে। তাই সনাতনধর্মীরাও দৃঢ় প্রত্যয়ী হচ্ছেন যে অন্তত জীবনব্যবস্থা ও সংস্কৃতির জন্য তাদের পাশ্চাত্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে না। চূড়ান্ত বিচারে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ কেবল বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টানদের কাছে কাম্য হতে পারে কেননা তাদের উভয়েরই ধর্মের সামষ্টিক জীবনবিধান নেই, আছে কেবল আত্মিক উন্নতির দিক-নির্দেশনা। তথাপি তারা রাজনীতির হাতিয়ার হিসাবে এখনো ধর্মকে ব্যবহার করে যাচ্ছে। উদাহরণ রোহিঙ্গা নির্যাতন ও প্যারিস হামলা। সম্প্রতি প্যারিসে আই.এস-হামলার পর ব্রিটেনে মুসলিম বিদ্বেষ শতকরা ৩০০% বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পত্রিকায় এসেছে। এই বিদ্বেষকেই আরো বৃদ্ধি করে ডানপন্থী দলগুলো জনপ্রিয়তার পারদ উর্ধ্বে তোলার চেষ্টা করেছে। পাঠক নিশ্চয়ই জানবেন যে ইউরোপে ডানপন্থী দল বলতে ধর্মহীন বামপন্থীদের বিপরীতে খ্রিষ্ট ধর্মানুভূতিকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক দলগুলোকে বোঝানো হয়। শরণার্থী মুসলিমদেরকে দেশে ঢুকতে না দেওয়া, সন্ত্রাসী সন্দেহে অভিবাসী মুসলিমদের জীবনকে সমস্যা-সংকুল করে তোলাই তাদের এখনকার রাজনৈতিক কর্মসূচি। বাইবেলে ধারণা দেওয়া হয়েছে যে, হাজার বছরের শিরোভাগে ঈসার (আ.) পুনরাগমন হবে এবং তিনি ইবলিসকে বেঁধে রেখে এক হাজার বছর শান্তিতে দুনিয়া শাসন করবেন (রিভিলেশান ২০:১-৫)। এজন্য প্রতি মিলেনিয়ামের প্রারম্ভে তারা যিশুর আবির্ভাবের সম্ভাবনায় ক্রুসেডের সূচনা করে। ইরাক আক্রমণের আগে জর্জ বুশ ক্রুসেডের ঘোষণা দিয়েছিলেন সে কথা সচেতন ব্যক্তিমাত্রই জানেন। সবার মুখে এখন কেবল ধর্ম-ধর্ম-ধর্ম।

৬. ইসলাম ও সনাতন ধর্মে জাতীয় বিধান থাকায় সৃষ্ট মানসিক সঙ্কট:

ধর্মগ্রন্থে শরিয়াহ থাকা ও না থাকার পার্থক্যটি বাস্তব উদাহরণের দ্বারা পরিষ্কার করার চেষ্টা করছি। কোর'আনে রাষ্ট্রীয় জীবনবিধান আছে, নিউ টেস্টামেন্টে তা নেই। একজন মুসলিম যখন জানতে পারে যে মদ্যপান, শুকর ভক্ষণকে আল্লাহ হারাম করেছেন তখন তার হৃদয়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা সৃষ্টি হয়। এটা তার ব্যক্তিজীবনের পছন্দ-অপছন্দকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাই অপর কোনো জীবনব্যবস্থা যখন মদ্যপানের বৈধতা দেয় তখন ঐ ব্যবস্থা সম্পর্কেও মুসলিমদের হৃদয়ে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। যদি কোনো মুসলিম মদ্যপান করেও তার ভিতরে অপরাধবোধ অবশ্যই জাগ্রত থাকে। এই অপরাধবোধ কিন্তু খ্রিষ্টানদের মধ্যে জাগ্রত হয় না, কারণ মদ্যপান তাদের ধর্মে নিন্দনীয় নয় বরং তা তাদের ধর্মীয় উৎসবের বিশেষ অনুষঙ্গও বলা যায়। এ কারণে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বীরা সহজেই মনগড়া বিধান মেনে নিতে পেরেছে কেননা এতে ঐ সবের প্রতি মনগড়া বিধানগুলোতেও কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই।

একইভাবে আল্লাহ সুদকে হারাম করেছেন। গণতন্ত্র যখন সুদকে জাতীয় অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হিসাবে স্বীকার ও প্রতিষ্ঠা করে তখনও মুসলিম হৃদয় তার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকে। কিন্তু জাতীয় জীবনের একটি ব্যবস্থাকে ব্যক্তি যতই অপছন্দ করুক তা মানতে বাধ্য হয়। সে যদি সুদ গ্রহণ করেও তার ভেতরে হারাম ভক্ষণের দরুণ বিবেকের দংশন থেকে যায় এবং এই অপরাধের জন্য সে রাষ্ট্রব্যবস্থাকেই দায়ী করতে থাকে। আবার দণ্ডবিধির বেলায় মুসলিম দেখে যে, ইসলামে পূর্ণাঙ্গ দণ্ডবিধি আছে, কিন্তু রাষ্ট্র তা স্বীকার না করে অন্য দণ্ডবিধির প্রয়োগ করছে। যেহেতু তার বিশ্বাস বা ঈমানের কারণে সে আল্লাহর দেওয়া বিধান বা হুকুমকে ত্রুটিহীন ও ন্যায়সঙ্গত মনে করে তাই ইউরোপের চাপিয়ে যাওয়া ব্যবস্থার বিধানগুলো তার কাছে ইসলামবিরোধী অর্থাৎ কুফর বলেই মনে হয়। এটা মনে হয় কারণ কোর'আন তো হারিয়ে যায় নি। যতদিন কোর'আন থাকবে, মুসলিমরা এই দ্বিধা ও আত্মিক সঙ্কট নিয়েই গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি মেনে চলবে। যারা সনাতনধর্মী তাদেরও দণ্ডবিধি আছে, হালাল-হারাম আছে। তাই তারাও পাশ্চাত্যের ব্যবস্থার সঙ্গে তাদের ধর্মের অনুশাসনের সংঘাতটি অনুধাবন করতে পারে। কিন্তু একজন খ্রিষ্টানকে এই বিশ্বাসের সঙ্কট মোকাবেলা করতে হয় না, কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থে তো দণ্ডবিধি বলতেই কিছু নেই। মুসলিমরা যেন জাতীয় জীবনে ইসলাম চর্চা করতে আগ্রহী না হয় সেজন্য ব্রিটিশরা তাদের প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থায় জাতীয় জীবনটাকে একেবারেই অপ্রয়োজনীয়, গৌণ বিষয়ে পরিণত করে মুসলিমদেরকে মলমূত্র ত্যাগের সময় কী দোয়া পড়তে হবে, টয়লেটে কোন পা দিয়ে ঢুকতে হবে বেরোতে হবে, কুলুখ কীভাবে করতে হবে, কবীরা গুনাহ কয়টি, ছগিরা গুনাহ কোনটি, দাড়ি কতটুকু রাখতে হবে, নারীর পর্দা কীভাবে করতে হবে ইত্যাদি খুঁটিনাটি বিষয়কে মহা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত করেছে। তারা এই ষড়যন্ত্রে শতভাগ সফল হয়েছে, কারণ বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিম ঐগুলোকেই ইসলাম বলে মনে করে। পক্ষান্তরে জঙ্গিবাদীরা চুরি করলে হাত কাটা, ব্যভিচারীকে দোররা মারা, খুনিকে শিরোশ্ছেদ করা, নাচ-গান-ভাস্কর্য নির্মাণ নিষিদ্ধ করা, বিধর্মীদের থেকে জিজিয়া নেওয়া, মেয়েদেরকে অবরুদ্ধ করাকেই ইসলাম মনে

আইএস-এর বর্বরতার চিত্র।

করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ঐগুলোই প্রয়োগ করার চেষ্টা করছে।

৭. জঙ্গিবাদী ইসলামটি আত্মাহীন ও জবরদস্তিমূলক বিধায় অগ্রহণযোগ্য:

ইসলামের যে তালেবানী রূপটি আমরা দেখছি তা বর্তমান যুগের অমুসলিম তো বটেই, মুসলিমদেরও ঘোর অপছন্দ। প্রকৃতপক্ষে ইসলাম সম্পর্কে পুরো মানবজাতিই ঘোর বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণার মধ্যে নিমজ্জিত আছে, তবে জঙ্গিদের পথভ্রষ্টতা ভয়ানক। কেননা তারা কোর'আন-হাদীসের অপব্যাখ্যাকে জোরপূর্বক অন্যের উপর চাপিয়ে সেটাকে ইসলাম বলে চালিয়ে দিতে সহিংস পন্থা অবলম্বন করছে। মানুষ জঙ্গিদের এই তথাকথিত 'শরিয়াহ শাসনকে' ভালোবাসে না ঘৃণা করে, একে তারা হৃদয় থেকে আলিঙ্গন করবে না প্রত্যাখ্যান করবে তারা এটা বিবেচনায় নিতে নারাজ। আল্লাহ বার বার বলেছেন যে, দীনের বিষয়ে কোনো জবরদস্তি নেই (সুরা বাকারা ২৫৬)। ইসলামের এই মূলনীতিটি জঙ্গিবাদীরা অস্বীকার করেই হোক বা আকীদার বিকৃতির দরুন না বুঝেই হোক মানুষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদের ধারণার একটি জবরদস্তিমূলক ব্যবস্থাকে চাপিয়ে দিতে চায়। তারা ১৪০০ বছরের দীর্ঘ সময়ে, বিশেষ করে গত কয়েক শতাব্দীতে মানবজাতির চিন্তার জগতে ও বাস্তব জীবনে যে অসম্ভব পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তাকে অস্বীকার করে যেটা প্রতিষ্ঠা করতে চায় সেটাও এক বর্বরতা, জুলুম, অন্ধত্ব, নৃশংসতা, অন্যায়। তারা ইসলামকে যুগোপযোগী করে উপস্থাপন করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। তারা যেটাকে ইসলাম বলছে সেটা কোনোভাবেই আল্লাহ-রসুলের প্রকৃত ইসলাম নয়, কারণ সেটা যেখানেই কার্যকর করা হয়েছে সেখানেই চরম দম বন্ধ করা পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, শান্তি, স্বস্তি, স্বাধীনতা কিছুই প্রদান করতে পারে নি।

যে রাষ্ট্রগুলোতে কথিত ইসলামী ভাবধারার সরকারব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত আছে সেগুলোতে কেউ ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করলে তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয়। সুদানের মেয়ে মরিয়মের কথা হয়তো এখনো অনেকেরই মনে আছে। তার বাবা মুসলিম এবং মা খ্রিষ্টান। মরিয়ম নিজেও তার মায়ের ধর্মেই বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ২০১১ সনে একজন আমেরিকান খ্রিষ্টান ছেলেকে ভালোবেসে বিয়ে করেন। এটা যখন সুদান সরকার জানতে পারে তখনই মরিয়মকে গ্রেফতার করে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। কারণ শরিয়া আইনের দৃষ্টিতে মরিয়ম পিতার ধর্ম স্বীকার করে মুসলিম হতে বাধ্য আর মুসলিম মেয়ে খ্রিষ্টান ছেলেকে বিয়ে করতে পারে না। কারাগারেই জন্ম নেয় তার একটি সন্তান। ধর্ম ত্যাগ করার অপরাধে আদালত তাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে পাশাপাশি খ্রিষ্টানকে বিয়ে করায় ব্যভিচারের দণ্ড হিসাবে ১১০টি দোররা মারার হুকুম প্রদান করে। তবে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে পারে নি সুদান সরকার কারণ মানবাধিকার সংগঠন ও আন্তর্জাতিক গোষ্ঠীর নজিরবিহীন চাপের মুখে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে তাকে খালাস দিতে বাধ্য হয় সরকার। এটা হচ্ছে অনুরূপ অসংখ্য ঘটনার মাঝে একটি ঘটনা যা আমরা জানতে পারছি গণমাধ্যমে ব্যাপক আলোচিত হওয়ার বদৌলতে। কিন্তু আশির দশক থেকেই সুদানে চলছে এহেন শরিয়াহ শাসন।

প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি আল্লাহ-রসুলের ইসলাম হলো? না। তা কখনোই হতে পারে না। প্রকৃত ইসলাম মানুষকে তার ব্যক্তিগত ধর্মাচরণের ব্যাপারে অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছিল। যারা ইসলাম ত্যাগের পর ইসলামের বিরুদ্ধে, সমাজের শান্তির বিরুদ্ধে প্রবল শত্রুতায় লিপ্ত হয়েছে তাদেরকে রসুলাল্লাহ রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করেছেন। কিন্তু মরিয়ম তো এমন

কিছু করে নি। তাহলে মানুষের ব্যক্তিগত ধর্মীয় স্বাধীনতা কোথায় গেল? এটা যদি জবরদস্তি না হয় তাহলে জবরদস্তি কাকে বলে? সুদানের মতো মোটামুটি মধ্যপন্থী দেশেও যদি ধর্মীয় স্বাধীনতার এই অবস্থা হয় তাহলে আই.এস. বা তালেবানের মোল্লাতান্ত্রিক শাসনে মানুষকে কেমন অবরুদ্ধ করা হয় তা সহজেই অনুমেয়। তারাও আদতে সেই ইউরোপিয়ান উপনিবেশবাদীদের মতোই ওপর থেকে একটি জীবনব্যবস্থা বলপূর্বক একটি জনগোষ্ঠীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে যা গ্রহণ করতে পৃথিবীর মানুষ এমন কি মুসলিমরাও প্রস্তুত নয়।

তালেবান শাসনে প্রাচীন আমলের বৌদ্ধমূর্তিগুলো ধ্বংসের ঘটনা তাদের অন্ধত্বের প্রমাণ। কেননা আফগানিস্তানের বামিয়ান এলাকা ইসলামের আওতায় প্রথম এসেছিল খলিফা ওমরের (রা.) যুগে। তখন রসুলাল্লাহর সাহাবীরা এই মূর্তিগুলোকে ইসলামের পক্ষে ক্ষতিকর মনে করলে ভেঙ্গে ফেলতে পারতেন। কিন্তু তারা তা করেন নি। আমর ইবনুল আস (রা.) আলেকজান্দ্রিয়াতে কপটিক খ্রিষ্টানদের আরাধনার জন্য যিশুর (আ.) মূর্তি নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। ঘটনাটি অনেকেরই জানা, তবুও সংক্ষেপে আবার বলছি।

আমর ইবনুল আস (রা.) এর মিসর বিজয়ের পর আলেকজান্দ্রিয়ায় কে একজন একদিন রাত্রে যিশু খ্রিষ্টের প্রস্তর নির্মিত প্রতিমূর্তির নাক ভেঙ্গে ফেলেছে। খ্রিষ্টানরা উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তারা ধরে নিল যে, এটা একজন মুসলিমেরই কাজ। আমর (রা.) সব শুনে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ তিনি প্রতিমূর্তিটি সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করে দিতে চাইলেন। কিন্তু খ্রিষ্টান নেতাদের প্রতিশোধ নেবার বাসনা ছিল অন্যরূপ। তারা বললো, "আমরা চাই আপনাদের নবী মোহাম্মদের (সা.) প্রতিমূর্তি তৈরি করে ঠিক অমনিভাবে তাঁর নাক ভেঙ্গে দেব।"

এ কথা শুনে বারুদের মত জ্বলে উঠলেন আমর (রা.)। প্রাণপ্রিয় নবীজির প্রতি এত বড় ধৃষ্টতা ও বেয়াদবি দেখে তাঁর ডান হাত তলোয়ার বাটের উপর মুষ্ঠিবদ্ধ হয়। ভীষণ ক্রোধে তাঁর মুখমণ্ডল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠলো। কিছুক্ষণ নীরব থেকে নিজেকে সংবরণ করে নিয়ে বললেন, "আমার অনুরোধ, এ প্রস্তাব ছাড়া অন্য যে কোন প্রস্তাব করুন আমি তাতে রাজি আছি।" পরদিন খ্রিষ্টানরা ও মুসলিমরা বিরাট এক ময়দানে জমায়েত হলো। আমর (রা.) সবার সামনে হাজির হয়ে বিশপকে বললেন, "এদেশ শাসনের দায়িত্ব আমার। যে অপমান আজ আপনাদের ধর্মের হয়েছে, তাতে আমার শাসন দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তরবারি গ্রহণ করুন এবং আপনিই আমার নাক কেটে দিন।" এই কথা বলেই তিনি বিশপকে একখানি তীক্ষ্ণধার তরবারি হাতে দিলেন। জনতা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, খ্রিষ্টানরা স্তম্ভিত। চারদিকে থমথমে ভাব।

সহসা সেই নীরবতা ভঙ্গ করে একজন মুসলিম সৈন্য এলো। চিৎকার করে বললো, "থামুন ! আমি ঐ মূর্তির নাক ভেঙ্গেছি। অতএব আমার নাক কাটুন।" বর্তমান বিকৃত ইসলামের ধারণায় অন্যধর্মের উপাসনালয়ের মূর্তি ভাঙ্গা আর প্রকৃত ইসলামের সৈনিকদের দ্বারা অন্যজাতির পূজার জন্য মূর্তি বানিয়ে দেওয়ার মধ্যে রয়েছে প্রকৃত ইসলাম আর বিকৃত ইসলামের ধারণাগত বিস্তর ফারাক। যাক সে কথা। বিজিতদের উপরে বিজয়ীদের এই উদারতায় ও ন্যায়বিচারে মুগ্ধ হয়ে সেদিন শত শত খ্রিষ্টান ইসলাম কবুল করেছিলেন। এই হচ্ছে ভিন্ন ধর্মের অবতার বা মহামানবদের ভাস্কর্যের প্রতি রসুলের আসহাবদের সম্মান প্রদর্শনের নমুনা। অথচ ধর্মান্ধ জঙ্গিরা আজ বোমা মেরে বুদ্ধের মূর্তি ভেঙ্গে ফেলে ইসলামের দোহাই দিয়ে। তারা কি রসুলের আসহাবদের থেকেও বেশি ইসলাম জানেন? না, সেটা সম্ভব নয়। যে জীবনব্যবস্থা তা ধর্মভিত্তিকই হোক বা ধর্মনিরপেক্ষই হোক, মানুষের মন-মানসিকতার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল ও প্রতিকূল হলে, তা যুগের তৃষ্ণা মেটাতে না পারলে, তা যুগের চাহিদা বলে পরিগণিত না হলে সেটা প্রতিষ্ঠিত হলেও শান্তিময় হবে না, টেকসই হবে না।

৮. শোষণের টাকায় পাশ্চাত্য উন্নতি করেছে, গণতন্ত্রের আশীর্বাদে নয়:

যেটা বলছিলাম, আমাদের প্রাচ্যের সমাজ বিশ্বাসভিত্তিক। সে কারণেই এখানে ধর্মনিরপেক্ষতা টেকসই হচ্ছে না, কয়েক শতাব্দী ঝাঁকাঝাঁকি করা সত্ত্বেও তেলে জলে মিশছে না। এ জাতির জন্য বিষয়টা এমন হয়েছে যে, দীর্ঘদিন থেকে যে শিশুটি দুধ পান করে আসছিলো তাকে ভুল বুঝিয়ে মার্বেল খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। মার্বেলগুলো পেটের মধ্যে গিয়ে জায়গা দখল করে আছে। হজমও হচ্ছে না, শরীরকে পুষ্টও করছে না বরং পেটে ব্যথার সৃষ্টি করছে। শিশুটি চিৎকার করে কান্না করছে আর মার্বেলগুলো উগরে দেবার চেষ্টা করছে। তাই তৃতীয় বিশ্বের গণতন্ত্র শিশুই থেকে যাচ্ছে। পাশ্চাত্য শত শত বছর ধরে উপনিবেশ স্থাপন করে দুনিয়া শোষণ করেছে, তারা বিরাট সম্পদের পাহাড়ে বসে আছে। এখনো পুঁজিবাদের শুঁড় দিয়ে দুনিয়ার সম্পদ শোষণ করে যাচ্ছে। এই বিপুল সম্পদ বিনিয়োগ করে তারা দুনিয়ার মেধাবী মানুষগুলোর মেধাকে কিনে নিয়েছে, তারা বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে অকল্পনীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি সাধন করেছে। আকাশ, সমুদ্র, মেরু, মরু, পাহাড় সবই এখন তাদের হাতের মুঠোয়। তাদের বৈষয়িক উন্নতি দেখে আমরাও চাই তাদের মতো হতে, আমরা ভুলে যাই যে, তাদের অত্যাধুনিক শহরগুলোর ইট-বালু-সিমেন্টে মিশে

আছে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও অস্থি, রক্ত, মাংস। ব্রিটেনের রানীর মুকুটে এখনো দিল্লির কোহিনূর শোভা পায়। এই ভয়াবহ পশ্চিমাদের প্রতিটি পদক্ষেপ, কৃষ্টি-কালচার অন্ধভাবে অনুকরণ করার মানসিক দাসত্ব থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। তাদের অধিকাংশ মানুষ দু স্লাইস পাউরুটিতে জেলি মাখিয়ে খেয়ে কাজে যায় পক্ষান্তরে আমাদের দেশের চাষী লবণ মরিচ দিয়ে পান্তাভাত পেটপুরে খেয়ে লাঙ্গল কাঁধে মাঠে যায়। এই চাষীকে যদি বলা হয় দুই পিস পাউরুটি খেয়ে হালচাষ করতে সেটা যেমন অসম্ভব তেমনি অসম্ভব বাংলাদেশে তাদের অনুকরণে গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের নামে জাতীয় জীবনে ধর্মহীনতার চর্চা করে সামাজিক শান্তি, সুশাসন, উন্নয়ন, প্রগতি নিশ্চিত করা। তাছাড়া তাদের দেশেও কি ধর্মনিরপেক্ষতা শান্তিপূর্ণ ফল দিয়েছে? মোটেও না। তারা ভোগবিলাস আর আরাম আয়েসে আছে বটে কিন্তু তাদের নৈতিক অবক্ষয় সীমা ছাড়িয়ে গেছে। আত্মহত্যার প্রবণতা এই উন্নত দেশগুলোতে সর্বাধিক, হত্যা ধর্ষণসহ যাবতীয় সামাজিক অপরাধেও তারা সবার অগ্রবর্তী। প্রযুক্তি যত অগ্রসর হচ্ছে তারা তত অত্যাধুনিক অপরাধের উদ্ভাবন ঘটাচ্ছে। তারা দুটো বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়েছে, তিন নম্বরটি ঘটাতে যাচ্ছে। তথাপি আমাদের চোখে তারাই শ্রেষ্ঠ, আমরা ক্রিম লাগিয়ে আমাদের চামড়ার রঙ পর্যন্ত তাদের মতো করতে চাই। তাদের সকল প্রতারণাও আমরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখি।

আমাদেরকে বুঝতে হবে যে, গণতন্ত্র এখন সাম্রাজ্যবাদীদের হাতের রিমোট কন্ট্রোল যার দ্বারা তারা অতীতের উপনিবেশগুলোর উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ, শাসন ও শোষণকে বজায় রাখছে। তারা নিজেরাও যে গণতন্ত্রকে বেদবাক্য জ্ঞান করে, তা কিন্তু নয়। তারা যেখানে যেটা প্রযোজ্য সেখানে সেটা ব্যবহার করে। তারা বিশ্বাসঘাতক আরবদের রাজতন্ত্রকে তেলের বিনিময়ে সহ্য করে যাচ্ছে। মিশরে তারাই সামরিক সরকারকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত মুরসি সরকারকে ধ্বংস করেছে। এমনকি নিজেদের ব্রিটেনে এখনো রাজতন্ত্রকে জাতির ঐক্যসূত্র হিসাবে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু আমাদের দেশে কোনো ঐক্যসূত্র তারা রাখতে দেয় নি। তাই যে কোনো বিষয়ে আমরা শতধাবিভক্ত। এমন স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ এই দুটো বড় বিভক্তি স্বাধীনতার ৪৪ বছর পর নিষ্পত্তি করা যায় নি। ইচ্ছা করে টিকিয়ে রাখা হয়েছে। আমরা মহাজ্ঞানী কিন্তু এটা বুঝতে অক্ষম যে ঐক্যসূত্র ছাড়া কোনো জাতিই সমৃদ্ধি অর্জন তো দূরের কথা, সার্বভৌম অস্তিত্বই বজায় রাখতে পারে না।

এই কারণেই আপাত স্বাধীনতা সত্ত্বেও পশ্চিমাদের সাবেক উপনিবেশগুলো আঞ্চলিক হোক আর পশ্চিমের হোক, কোনো না কোনো শক্তিধর রাষ্ট্রের স্যাটেলাইট হয়েই আছে। বোধোদয় ছাড়া এই দুষ্টগ্রহ থেকে উপগ্রহের মুক্তি নেই।

স্বদেশের প্রেক্ষাপটে ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা

বর্তমানে আমরা জাতি হিসাবে দ্বিধাগ্রস্ত, ধর্মকে নেব না আধুনিকতাকে নেব? আমাদের অনেকের নামের মধ্যেও এই দ্বন্দ্বটি প্রকটিত হয়। ভালো নামটি রাখা হয় ইসলামিক ভাবধারায় আর ডাক নামটি আধুনিক অর্থাৎ ইংরেজি, বাংলা বা কোনোটাই নয় এমন অর্থহীন শব্দে। দুই প্রজন্মের দুই মানসিকতার ব্যক্তির অবদানে নামের এই বিচিত্র রূপ সৃষ্টি হয়। ধর্ম আর আধুনিকতা - এ দুটি বিষয় যেন একে অপরের শত্রু। ধর্মকে কোনোভাবেই আধুনিক করা গেল না। আর আমরা কোনটাই ছাড়তে পারছি না, তাই দু নৌকায় পা দিয়ে আছি আমরা।

পাশ্চাত্যের সংস্কৃতি আমাদের উজ্জ্বল আকর্ষণ নিয়ে হাতছানি দিচ্ছে, তার প্রভাবে ধর্ম ক্রমেই বিবর্ণ ও আকর্ষণহীন বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু ধর্মীয় মূল্যবোধ রক্তের কণিকায় মিশে আছে যা বাদ দেওয়া সহজ কাজ নয়। তবে শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মের প্রতি সন্দেহ সৃষ্টির যে প্রচেষ্টা বিগত শতাব্দীগুলোতে চালানো হয়েছে তা খুবই সফল হয়েছে। বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মাঝখানে আস্থাহীন ধর্মচর্চার রশিতে ঝুলে আছে সন্দেহবাদী শিক্ষিত সমাজ। তথাকথিত আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থায় এই দ্বিধা ও সন্দেহ সৃষ্টির সচেতন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

এ শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মকে রাখা হয়েছে নামমাত্র। ধর্ম বইতে বলা হচ্ছে সমস্ত কিছুর মালিক স্রষ্টা, অথচ অন্য সকল বইয়ে 'আল্লাহ' শব্দটিও খুঁজে পাওয়া মুশকিল, পরোক্ষভাবে স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। কৌশল করে ধর্মকে সবচেয়ে গুরুত্বহীন বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষা বইতে যতটুকু ধর্ম শেখানো হয়েছে তার পুরোটাই ব্যক্তিগত জীবনের বিষয়, সামষ্টিক জীবন কীভাবে চলবে তা শেখানোর জন্য আছে অন্যান্য বিষয়সমূহ। বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে, আদ্যিকালের পুরাতন স্রষ্টার আধুনিক জীবনের জটিলতার সমাধান করার মতো জ্ঞান নেই, তাই এ বিষয়ে তিনি নীরব। মানুষের মনকে ধর্মবিমুখ ও অবজ্ঞাপ্রবণ করে তোলার এটি হচ্ছে একটি সুদূরপ্রসারী প্রক্রিয়া।

'ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ' দর্শনটি উনিশ শতকে যুক্তরাজ্য থেকে প্রথমত উদ্ভূত হয়েছে। বাংলা একাডেমীর ইংলিশ-বাংলা ডিকশনারিতেও Secular-(অর্থ) পার্থিব, ইহজাগতিকতা, জড়, জাগতিক। আর Secular State অর্থ 'গীর্জার সঙ্গে বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র'। অর্থাৎ ধর্মের বৈপরিত্যক্রমে রাষ্ট্র। Secularism অর্থ নৈতিকতা ও শিক্ষা ধর্মকেন্দ্রিক

ইউরোপে ধর্মনিরোপেক্ষতা যেভাবেই প্রয়োগ হোক না কেন আমাদের এ অঞ্চলে কিন্তু 'ধর্মনিরপেক্ষতা' মানে ধর্মহীনতা নয়। এর মানে হলো সব ধর্মের মানুষের সমান অধিকার রয়েছে ধর্ম পালনের।

হওয়া উচিত নয়- এই মতবাদ। জাগতিকতা, ইহবাদ। ধর্মনিরপেক্ষতার উদ্ভবের প্রেক্ষাপট ও ডিকশনারির অর্থ দেখলে এটা সুস্পষ্ট হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ মূলত ধর্মহীনতাকেই বোঝায়।

Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে যে Secular ব্যক্তি হচ্ছেন তিনি যিনি আধ্যাত্মিক বিষয় বা ধর্মীয় বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত নন (Not connected with spiritual or religious matter). অর্থাৎ ইউরোপে যখন ধর্মনিরপেক্ষতার বিকাশ হয় তখন তা মূলত ধর্মহীনতার ধারণাকেই ভিত্তি করেছিল। কিন্তু ধর্মবিশ্বাসী মানুষ সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই বাস্তবতার নিরিখে ধর্মহীনতা শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিসংগত হবে না বিধায় একটি প্রতারণামূলক শব্দ "ধর্মনিরপেক্ষতা" তারা ব্যবহার করতে শুরু করল কিন্তু মূল উদ্দেশ্য, যাত্রা অবিচল রইল। তাদের অনুকরণে আমাদের দেশের সংবিধানেও রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসাবে "ধর্মনিরপেক্ষতা" প্রবেশ করানো হলো। এর ব্যাখ্যা নিয়ে শুরু হলো বহু আলোচনা-সমালোচনা। আলেমদের একটি বড় অংশ এই প্রশ্নে দেশের সংবিধানকে কুফরি সংবিধান বলে ফতোয়া দিচ্ছেন।

কথা হচ্ছে ডিকশনারিতে যা-ই থাকুক, আমাদের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মনিরপেক্ষতার ব্যাখ্যা কী হবে, চর্চা কেমন হবে তা নির্ধারণ করার অধিকার অবশ্যই সরকারের আছে। ৪৪ বছর ধরে অস্পষ্ট থাকা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট হওয়া গুরুত্বপূর্ণ কেননা রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মবিশ্বাসী মানুষের আত্মার যোগসূত্র থাকা বাধ্যতামূলক, অন্যথায় সাম্প্রদায়িক অসহিষ্ণুতা, ধর্মীয় অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করা যাবে না। আমরা কীভাবে আমাদের রাষ্ট্র চালাবো সে বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় উপস্থিত হয়েছে, বাঁদরের মতো পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুকরণ করা পরিত্যাগ করতে হবে। পশ্চিমাদের থেকে যদি চলনসই কিছু থাকে তা অবশ্যই গ্রহণ করব, কিন্তু ক্রীতদাসের মতো অন্ধ আনুগত্য থেকে আমাদের বিরত হতে হবে। আর এ সিদ্ধান্ত নিতে হলে ধর্ম ইস্যুটি বার বার সামনে চলে আসবে। অন্য যে নীতিগুলো আসবে না সেগুলোর ব্যাপারে কথা বলা নিষ্প্রয়োজন। প্রমাণ দিই একটা। ১৫ তম সংশোধনীর মাধ্যমে বাহাত্তর সালের সংবিধানে ফেরত যাওয়ায় রাষ্ট্রের মৌলিক নীতিগুলোর মধ্যে 'সমাজতন্ত্র'ও ফিরে এসেছে। কিন্তু সকলেই জানে যে, বাংলাদেশ এখন সম্পূর্ণ পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক একটি রাষ্ট্র। বাহাত্তর সালে সংবিধানে যখন সমাজতন্ত্র ছিল তখন তো বিশ্বের বড় বড় দুটি রাষ্ট্রে রাশিয়া ও জার্মানে সমাজতন্ত্র চালু ছিল, এখন সেগুলো ধনতন্ত্রের স্বর্গরাজ্য। অথচ আমরা এখন ফিরিয়ে এনেছি 'সমাজতন্ত্র', কিন্তু চলছি পুঁজিবাদী নীতিতে। বাঘা বাঘা সমাজতান্ত্রিকরা পুরো গণতন্ত্রের জোব্বা গায়ে দিয়ে পাক্কা বুর্জোয়া বনে গেছেন। এটা নিয়ে কোন বিশ্লেষণ নেই, ঝগড়া-ঝাটিও নেই, সব ঝগড়া এই ধর্মনিরপেক্ষতা আর ধর্ম নিয়ে। কারণ বর্তমানে ধর্মই বিশ্বের এক নম্বর ইস্যু।

সংবিধানের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ৩৯ ও ৪১ ধারা অনুযায়ী সকলেরই এখানে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা রয়েছে। সংবিধানে বলা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন।"

আমাদের দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ধর্মনিরপেক্ষতার কী ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সেটার আলোকেই এই ভূখণ্ডে 'ধর্মনিরপেক্ষতা' দর্শনটির চর্চা করা হবে। তিনি ২০ অক্টোবর ২০১৫ তারিখে দুর্গাপূজার উৎসবে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন,

'ধর্মনিরপেক্ষতা' মানে ধর্মহীনতা নয়। এর মানে হলো দেশের সব মানুষের সমান অধিকার রয়েছে যার যার ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনের।'

অর্থাৎ তিনি পাশ্চাত্যের আচরিত বা এনসাইক্লোপিডিয়ায় প্রদত্ত ধর্মহীনতার পক্ষে নন। তিনি আমাদের দেশের বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, ধর্মহীনতা যেখানেই চলুক অন্তত আমাদের এদেশে তা চলনসই নয়।

ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি সুস্পষ্ট করার জন্য আরো বলেছেন, 'আমাদের প্রিয় নবী করিম (সা.) তাঁর মদিনা সনদ ও বিদায় হজ্বে যেটা বলে গেছেন, ঠিক সেভাবেই এই দেশ চলবে। বাংলাদেশ একটি রাজাকার, আল বদরমুক্ত গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক দেশ হবে। মদিনা সনদে সব ধর্মীয় গোষ্ঠীর অধিকার যেভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছিল, আমরা তার আলোকে অসাম্প্রদায়িক দেশ গড়ে তুলব।" (প্রথম আলো, ২২ মার্চ ২০১৪)। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

মদিনা সনদ কী ছিল?

৬২২ খ্রিষ্টাব্দে মহানবী মদিনায় হিজরত করেন। এসময় সেখানে বসবাসরত বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে ছিল গোষ্ঠীগত হিংসা-বিদ্বেষ। তাই কলহে লিপ্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি ৪৭ ধারার একটি শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করেন যা মদিনা সনদ নামে পরিচিত। প্রাসঙ্গিকতার স্বার্থে মদিনা সনদের ধর্মীয় স্বাধীনতা সম্পর্কিত নীতিগুলো এখানে বলতে হয়:

১) সনদপত্রে স্বাক্ষরকারী সম্প্রদায়সমূহ একটি সাধারণ জাতি গঠন করবে।

২) মুহাম্মদ (স.) এই সাধারণ জাতির নেতৃত্ব দিবেন।

৩) কোন সম্প্রদায় গোপনে কোরায়েশদের সাথে কোন প্রকার সন্ধি করতে পারবে না কিংবা মদীনা বা মদীনাবাসীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে কোরায়েশদের কোনোরূপ সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারবে না।

৪) মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইহুদি, পৌত্তলিক ও অন্যান্য সম্প্রদায় ধর্মীয় ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করবে। কেউ কারো ধর্মীয় কাজে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৫) মদিনার উপর যে কোন বহিরাক্রমণকে রাষ্ট্রের জন্য বিপদ বলে গণ্য করতে হবে। এবং সেই আক্রমণকে প্রতিরোধ করার জন্য সকল সম্প্রদায়কে এক জোট হয়ে অগ্রসর হতে হবে।

৬) কোন লোক ব্যক্তিগত অপরাধ করলে তা ব্যক্তিগত অপরাধ হিসেবেই বিচার করা হবে। তজ্জন্য অপরাধীর সম্প্রদায়কে দায়ী করা যাবে না।

৭) মুসলমান, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা পরস্পর বন্ধুসুলভ আচরণ করবে।

৮) রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিষ্পত্তির অধিকার থাকবে রাষ্ট্রপ্রধানের এবং তিনি হবেন সর্বোচ্চ বিচারক।

এখানে ৪, ৬ ও ৭ নম্বর ধারাগুলো সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা ও সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানকে নিশ্চিত করে যা ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটিকে প্রধানমন্ত্রী যে দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ব্যাখ্যা করেছেন তার সঙ্গে সঙ্গতিশীল। একজন সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী ধর্ম নিয়ে বিকৃত রুচির লেখালেখি না করার পরামর্শ দিয়ে বলেন, "আমরা ধর্মনিরপেক্ষ। কিন্তু সেক্যুলারিজম মানে ধর্মহীনতা নয়। তাই কেউ ধর্ম মানবে কি মানবে না, সেটা তার ব্যাপার। কিন্তু অন্যের ধর্মে আঘাত দিতে পারবে না। বিকৃত লেখা মানবিক গুণ নয়। কারও অনুভূতিতে যেন আঘাত না লাগে সে বিষয়ে লক্ষ রাখাই মানবিকতা।" (দৈনিক ইত্তেফাক ৯ নভেম্বর ২০১৫)।

যে কোনো ধর্ম অবমাননার বিরুদ্ধে সরকারের অবস্থান জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন, "কোনো ধর্মের অবমাননা বরদাশত করব না। নবী করিম (স.) কে কটূক্তি করলে আমরা মানব না। ব্যবস্থা নেবোই।" এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানোকে 'অপরাধ' হিসাবে দেখছেন, 'মত প্রকাশের অধিকার' হিসাবে নয়। এ বিষয়টিও ইতিবাচক। জাতির ঐক্য রক্ষা ও রাষ্ট্রের অরাজকতা প্রতিরোধের জন্য স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতার লাগাম টেনে ধরার প্রয়োজনীয়তা আছে।

আমরা বিশ্বাস করতে চাই যে, তার এই বক্তব্য রাজনৈতিক বক্তব্য নয় বরং বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও ঈমান-বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই তিনি পাশ্চাত্যের ধর্মহীনতার নীতি পরিহার করেছেন যা অত্যন্ত যৌক্তিক। তিনি অন্তত অনুধাবন করেছেন যে পাশ্চাত্যের ঐ ধর্মহীনতার নীতি আমাদের সমাজে খাপ খাবে না। কিন্তু মদিনা সনদের সঙ্গে সংবিধানের কিছু ধারা মিললেও বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ একটি অমিল রয়ে গেছে। মদিনা সনদের সার্বভৌমত্বের অর্থাৎ সিদ্ধান্তের মালিক ছিলেন আল্লাহ কেননা রসুলাল্লাহ তো আল্লাহর বিধান মোতাবেকই সিদ্ধান্ত দিবেন। এটাই হচ্ছে মদিনা সনদের ভিত্তি, গোড়া। পক্ষান্তরে আমাদের শাসনব্যবস্থার ভিত্তিটা কিন্তু রয়ে গেছে সেই পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী বস্তুতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার উপর। একটি বাড়ি তাজমহলের মতো কারুকার্যময় ও পিরামিডের মতো মজবুত হলেও তার ভিত্তি যদি হয় বালুর উপরে তাহলে সেই বাড়ি ক্ষণস্থায়ী।

কিন্তু পশ্চিমাদের প্রকল্পিত ধর্মনিরপেক্ষতা যার যার ধর্মপালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তাদের সুদূরপ্রসারী

চেষ্টা ছিল ধর্মই থাকবে না। জাতীয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আলাপ-আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ধর্মের কোন অস্তিত্বই থাকবে না। এটাকেই তারা এতদিন থেকে চাপিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমাদের জনমনে তা গৃহীত হয় নি। আমাদের শাসকশ্রেণী ও সংবিধান রচয়িতাগণ ধীরে ধীরে এ এলাকার মানুষের সেন্টিমেন্টকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছেন এবং সেটাকে তারা বিবেচনা করেছেন। এজন্যই মদিনা সনদের কথা আসছে, রাষ্ট্রধর্ম, বিসমিল্লাহ দিয়ে সংবিধান শুরু করার বিষয়গুলো এসেছে। আমাদের শাসকরা ধর্মহীনতা পর্যন্ত যেতে পারেন নি।

কিন্তু এক শ্রেণির তাত্ত্বিক যারা পশ্চিমাদের খেয়ে পুষ্ট হয়েছেন, তারা বার বার জাতিকে রাষ্ট্রীয় ও ব্যক্তি জীবনে ধর্মহীনতার দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু ভোটারদের সেন্টিমেন্ট চিন্তা করে শাসকশ্রেণী অত্যন্ত সচেতনভাবে ঐ সীমারেখা রক্ষা করে চলেছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও সেই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করেছেন, পশ্চিমাদের নীতি যে এখানে চলবে না এটা তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পেরেছেন। এজন্যই তিনি স্পষ্টত ধর্মকে আক্রমণকারীদের ব্যাপারে কঠোর অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ কথাটি গণমাধ্যগুলোকেও বুঝতে হবে, বাম ঘরানার রাজনীতিক ও তাত্ত্বিকদেরকেও বুঝতে হবে। না বুঝলে কচ্ছপের শরীরে বকের মাথা জুড়ে বকচ্ছপ হয়েই থাকতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, নিজ জাতির পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করুন। দেশের স্বাধীন সত্ত্বা, সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ঐ অর্থহীন চেষ্টা থেকে বিরত হোন। অনেক চেষ্টা করেছেন, সব গুড়ে বালি। রাশিয়ার মতো কট্টর কম্যুনিস্ট, নাস্তিক শাসনব্যবস্থার দেশ যারা বিগত শতকে কেবল মসজিদ, গীর্জা ভেঙেই এসেছে তারাও এখন মস্কো শহরে মসজিদ নির্মাণ করছে এবং মুসল্লিদের সঙ্গে পুতিন বুক মেলাচ্ছেন। এ থেকে শিক্ষা নিতে হবে।

আমরা পাশ্চাত্যের চশমা দিয়ে দেখতে এতটাই অভ্যস্ত যে, জঙ্গিবাদ মোকাবেলার ক্ষেত্রেও আমরা ধর্মনিরপেক্ষ যুক্তি, মানবতাবাদ ইত্যাদি উপস্থাপন করি, সমস্যার গোড়া কোথায় তা ভেবে দেখি না। এতে আমাদের কথাগুলো হয়তো এক শ্রেণির পাঠক-শ্রোতার কাছে আকর্ষণীয় মনে হতে পারে কিন্তু জঙ্গিবাদীদের কাছে অর্থহীন। নাস্তিককে কোর'আন দেখানো যেমন কামারশালায় কোর'আনপাঠ, তেমনি জঙ্গিবাদীদের কাছেও সেক্যুলার যুক্তির কোনোই আবেদন নেই। তারা শুধু ধর্মীয় কেতাবে বিশ্বাসী। এই সত্যটি এখন অনেকেই উপলব্ধি করছেন। যেমন আমাদের দেশের সাবেক বিডিআর প্রধান মেজর জেনারেল (অব.) আ ল ম ফজলুর রহমান বলেছেন,

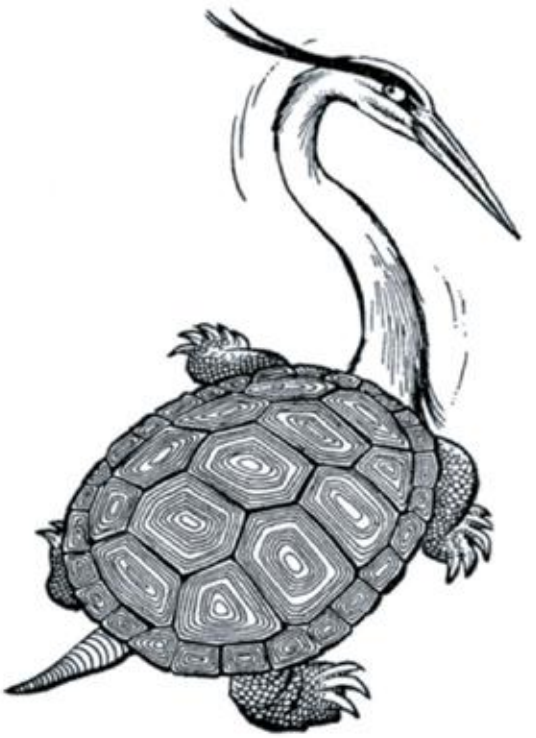

এ কথাটি গণমাধ্যগুলোকেও বুঝতে হবে, বাম ঘরানার রাজনীতিক ও তাত্ত্বিকদেরকেও বুঝতে হবে। না বুঝলে কচ্ছপের শরীরে বকের মাথা জুড়ে বকচ্ছপ হয়েই থাকতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, নিজ জাতির পরিচয় ও স্বাতন্ত্র্যকে সম্মান করুন। দেশের স্বাধীন সত্ত্বা, সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ঐ অর্থহীন চেষ্টা থেকে বিরত হোন। অনেক চেষ্টা করেছেন, সব গুড়ে বালি।

'আমাদের জঙ্গিকে মোকাবেলা করতে হলে অনেক পরিকল্পনা নিয়ে এগুতে হবে। জঙ্গিদের মোকাবেলা কোর'আন-হাদিস দিয়ে করতে হবে, সেক্যুলারিজম দিয়ে এটাকে মোকাবেলা সম্ভব নয়'। (চ্যানেল আই 'তৃতীয় মাত্রা' ১৯ অক্টোবর ২০১৫)

ধর্ম-সম্প্রদায়সমূহের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি অপরিহার্য

বর্তমান বিশ্বে জাতিতে জাতিতে দেশে দেশে চলমান যুদ্ধ ও রক্তপাতের অন্যতম কারণ হচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। যে যুদ্ধগুলো আপাতদৃষ্টিতে রাজনীতিক ও স্বার্থের দ্বন্দ্বের জের হিসাবে ঘটছে বলে মনে হয় সেগুলোর গভীরে গেলেও দেখা যায়, এর শেকড় প্রথিত আছে ধর্মবিদ্বেষের ভূমিতে। সভ্যতার মান রাখতে ধর্মনিরপেক্ষতার আচকান গায়ে চাপিয়ে মূলত সাম্প্রদায়িক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করে যাচ্ছে বিভিন্ন

'ধর্মানুসারী' উগ্র পরাশক্তিগুলো।

বিশ্বের প্রধান ধর্মগুলোর মাঝখানে যেমন দাঁড়িয়ে আছে অনেক উঁচু প্রাচীর, তেমনি প্রতিটি ধর্মের মধ্যেও আছে বাদানুবাদ, ফেরকা, মাজহাব। মুসলমানদের ভিতরে আছে শিয়া সুন্নী। সুন্নীদের মধ্যে আছে মালেকি, শাফেয়ী, হাম্বলি, হানাফি। শিয়াদের মধ্যেও আছে বহু ভাগ। আছে বহু সুফি তরিকা। একেক দেশে একেক চেহারার ইসলাম। খ্রিষ্টানদের মধ্যেও আছে ক্যাথেলিক-প্রোটেস্ট্যান্ট, সনাতন ধর্মীদের মধ্যে আছে বৈষ্ণব, শাক্ত, বৌদ্ধদের মধ্যে মহাযান, হীনযান প্রভৃতি। এ ফেরকাগুলোর মধ্যে রয়েছে শত্রুতার সম্পর্ক। এই সব বিভক্তিকে কালে কালে স্বার্থের হাতিয়ার বানিয়েছে শাসক ও রাজনৈতিক গোষ্ঠী, কায়েমী স্বার্থবাদীরা। তারা অর্থ দিয়ে ধর্মব্যবসায়ীদের কিনে নিয়েছে। ধর্মের ধ্বজাধারীরা মানুষের ঈমানকে, ধর্মীয় আবেগকে নিজেদের ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের অনুকূলে প্রবাহিত করে ধর্মকে কালিমালিপ্ত করেছে। পরিণামে সৃষ্টি হয়েছে ভয়াবহ দুর্যোগ। এরই পরিণামে ইউরোপে মধ্যযুগে ধর্মকে রাষ্ট্রব্যবস্থা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে কিন্তু ব্যক্তিজীবন থেকে বাদ দিতে পারে নি। রাষ্ট্র ব্যক্তিকে নিজ ধর্মমতে উপাসনা ও ব্যক্তিগতভাবে চর্চা করার স্বাধীনতা দিয়েছে।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী ধারণার উপরে পাশ্চাত্যের এবং তাদের অনুসরণে আমাদের সংবিধান রচিত হয়েছে। সংবিধান নামক কিতাবে লেখা আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম পালনে রাষ্ট্র সমমর্যাদা ও সম-অধিকার নিশ্চিত করিবেন। [প্রথম ভাগ (প্রজাতন্ত্র), ধারা ২ক] ধর্ম নিরপেক্ষতা নীতি বাস্তবায়নের জন্য (ক) সর্ব প্রকার সাম্প্রদায়িকতা, (খ) রাষ্ট্র কর্তৃক কোন ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা দান, (গ) রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ধর্মীয় অপব্যবহার, (ঘ) কোন বিশেষ ধর্ম পালনকারী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্য বা তাহার উপর নিপীড়ন, বিলোপ করা হইবে। [সূত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ (রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি), ধারা ১২]।

এই নীতি পালন করতে গিয়ে রাষ্ট্র সেনাবাহিনী, পুলিশ দিয়ে মসজিদ, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা পাহারা দিচ্ছে। বিরোধাত্মক সম্প্রদায়ের কেউ এসে যেন কোনো নাশকতামূলক ঘটনা ঘটাতে না পারে সেজন্য বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো যেমন বড়দিন, ঈদ, পূজা, পূর্ণিমা তিথি ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলোতে ব্যাপক আইনশৃঙ্খলা বাহিনী মোতায়েন করছে। কিন্তু গত একশ বছরে সাম্প্রদায়িক হামলা, উপাসনালয়ের উপর পারস্পরিক হামলা কমে নি বরং বেড়েছে, বিদ্বেষ কমে নি, বরং বেড়েছে, এক ধর্মকে আক্রমণ করে আরেক ধর্মের পণ্ডিতদের লেখালিখি কমে নি, বরং বেড়েছে। দাঙ্গার সম্ভাবনা সব সময়ই বিরাজ করছে। সময় সুযোগ পেলে ধর্মবিদ্বেষ আগুনের মত ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। এখনো বাক-স্বাধীনতা ও মুক্তচিন্তার নামে ভিন্ন ধর্মের নবী-রসুল-অবতারদের বিষয়ে অশ্লীল সাহিত্য, অবমাননাকর চলচ্চিত্র, ব্যাঙ্গচিত্র আঁকা হয় এবং কথিত সভ্য দেশগুলোতেও এর ব্যাপক চর্চা হয়। এমন কি মোহাম্মদ (সা.) এর উপর কার্টুন আঁকার প্রতিযোগিতাও আয়োজন করা হয়ে থাকে ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গভূমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। সেখানে এন্টি ইসলামিক শ্লোগান লেখা টি-শার্টের ব্যবসা করা হয়, র‍্যালি করা হয়। এবং এ সবই করা হয় বাক-স্বাধীনতা (Freedom of speech) এর নামে। এসবের দ্বারা যদি কখনো কোনো মুসলিম আত্মসংবরণ করতে না পেরে হামলা চালিয়ে বসে, অমনি সমগ্র পশ্চিমা বিশ্ব ও তাদের অনুসারীরা শেয়ালের মত একসুরে চিৎকার শুরু করে দেয় যে মুসলিমরা সন্ত্রাসী। অথচ অপরাধ সংঘটনের উসকানি প্রদানও যে বড় অপরাধ তা এক্ষেত্রে গৌণ হয়ে যায়। আমাদের দেশের সংবিধানে এও আছে যে, নাগরিকদের মধ্যে ধর্মীয়, সামাজিক এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট করবার উদ্দেশ্যে কোনো সংগঠন করা ও তার সদস্য হওয়া যাবে না।

আমরা দেখি, পার্শ্ববর্তী দেশে হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী কর্তৃক গো-মাংস ভক্ষণ নিয়ে সহিংসতা সৃষ্টি করা হয়, মানুষ হত্যা করে ফেলা হয় তার প্রভাব আমাদের দেশেও পড়ে। মায়ানমারে রোহিঙ্গাদের উপর নৃশংসতার দ্বারা ক্ষুব্ধ মুসলমান রামুতে মঠ ভেঙ্গে ফেলে। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে সংবিধান যতই উন্নত হোক, সকল ধর্মের উপাসনাকেন্দ্রের প্রতি একই দৃষ্টিভঙ্গি রাখা হোক, যতই আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পাহারার ব্যবস্থা করা হোক কিন্তু এক ধর্মের লোকেরা যতদিন না অন্য ধর্মকে সম্মান করতে শিখবে ততদিন অন্য ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গেও তাদের বিদ্বেষ দূর হবে না, শ্রদ্ধা করা তো দূরের কথা। আন্ত-সাম্প্রদায়িক ঘৃণা যতদিন থাকবে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিকথা কেতাবেই থেকে যাবে। সকল সম্প্রদায়ের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে যদি ঐক্যের কোনো সূত্র দেখানো না যায়, তবে কোনদিনও এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বন্ধ হবে না। কারণ ধর্মব্যবসায়ীদের করা ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যাই এই বিভেদের প্রাচীর দাঁড় করিয়ে রেখেছে। এখানেও একই কথা, সেক্যুলার মানবতাবাদ দিয়ে নয়, সাম্প্রদায়িকতা মোকাবেলা করতে হবে ধর্মীয় শিক্ষার দ্বারাই, ধর্মগ্রন্থাদিতে উক্ত বাণী দ্বারাই।

এই আন্তঃধর্মীয় ঐক্য সৃষ্টির জন্য যে ঐক্যসূত্র অপরিহার্য তা আমরা বই, পত্রিকা ও প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরছি। আমরা বলছি যে, ধর্মগুলোর

উপাসনা পদ্ধতিতে তারতম্য থাকলেও প্রতিটি ধর্মের উদ্দেশ্য ও মৌলিক শিক্ষাগুলো অভিন্ন। সনাতন ধর্মাবলম্বীদেরকে বলছি, আপনারা যে মুসলমানদেরকে ঘৃণা করছেন অথচ পবিত্র কোর'আনে আল্লাহ ইসলামকে বলেছেন দীনুল কাইয়্যেমা যার অর্থ সনাতন, শাশ্বত, চিরন্তন জীবনবিধান বা ধর্ম। সব মানুষ একই স্রষ্টার সৃষ্টি, একই পিতা-মাতা অর্থাৎ ইসলাম ধর্মমতে আদম-হাওয়া, খ্রিষ্টান ধর্মমতে অ্যাডাম-ইভ, সনাতন ধর্মমতে আদম-হব্যবতীর সন্তান। সুতরাং আপনারা যে অন্য ধর্মকে অবহেলা করছেন, অথচ সেগুলোও একই স্রষ্টার প্রেরিত ধর্ম যা কালের প্রবাহে বিকৃত হয়ে গেছে। তথাপি তাদের ধর্মগ্রন্থ আর আপনার শাস্ত্র মিলিয়ে দেখুন হাজার হাজার মিল খুঁজে পাবেন।

আবার মুসলিমদেরকে বলতে হবে যে তাদের সনাতনধর্মীদের মূল শাস্ত্রগুলো তথা তাদের ধর্মও এসেছে আল্লাহরই কাছ থেকে। সনাতন ধর্মের অবতার আর ইসলামের নবী-রসুল আসলে একই বিষয়। তাঁরা সবাই মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার উপায় শিক্ষা দিতেই এসেছিলেন। তাঁরা অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন, ন্যায়ের জন্য যুদ্ধ করেছেন যেভাবে ইসলামের নবীরা সংগ্রাম করে মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন। সেটা না বুঝে আপনারা আল্লাহর একজন নবীকে প্রাণের চেয়ে ভালোবাসছেন অথচ আরেক নবী শ্রীকৃষ্ণকে গালি দিচ্ছেন, কোর'আনকে চুমু খাচ্ছেন আর বেদ-মনুসংহিতাকে অবমাননা করছেন, এই গালি, অসম্মানতো আল্লাহকেই করা হচ্ছে।

খ্রিষ্টানকে বলছি, আপনারা যে যিশুর (আ.) মূর্তি বানিয়ে তাঁর মহীমাকীর্তন করছেন আর মোহাম্মদকে (সা.) গালি দিচ্ছেন। অথচ যেই যিশু (আ.) মোহাম্মদকে (সা.) কত শ্রদ্ধা করেছেন, আবার মোহাম্মদও (সা.) যিশু খ্রিষ্টকে, মুসাকে (আ.) ভাই বলে সম্বোধন করেছেন। কাজেই তাঁদের মধ্যে কোনো বিরোধ ছিল না, কিন্তু তাঁদের অনুসারীরা তাঁদের পথ থেকে সরে গিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়ে সেই মহামানবদেরকেই কালিমালিপ্ত করে চলেছে। এখন সবাইকে বলতে হবে যে, মুসলিমরা, আপনারা আপনাদের কোর'আন থেকে সরে গেছেন, খ্রিষ্টানরা বাইবেল থেকে সরে গেছেন, হিন্দুরা বেদ থেকে, ইহুদিরা তাওরাত থেকে সরে গেছেন। কাজেই আপনাদের কারোই এখন কোনো ধর্ম নেই, আপনারা সবাই এখন পশ্চিমা বস্তুবাদী 'সভ্যতা' দাজ্জালের অনুসারী। সেই মহা প্রতারক আপনাদের সবাইকে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে রেখে নিজের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আপনারা সবাই এক অদ্বিতীয় স্রষ্টার হুকুম (তওহীদ) থেকে সবাই সরে গেছেন। ধর্ম এসেছে মানবতার কল্যাণে এই শিক্ষা সবাই ভুলে গেছেন। শিকড়বিহীন বৃক্ষ যেমন মরা কাষ্ঠখণ্ড তেমনি মানবতাবিহীন ধর্ম অর্থহীন। মরা কাঠ তবু জ্বালানি হিসাবে কাজে লাগে, কিন্তু বিকৃত ধর্ম কোনোই কাজে আসে না, তা উল্টো মানুষের ক্ষতি করে। আজ যখন মানবতা ভূলুণ্ঠিত, বোমার আঘাতে ছিন্নবিচ্ছিন্ন হচ্ছে মানুষ, ধর্ষিতা হচ্ছে ৩ বছরের শিশু, লাঞ্ছিত হচ্ছে নারী তখন সবার ধর্মবিশ্বাস অর্থহীন হয়ে গেছে। যতদিন না এই নারকীয় অশান্তি থেকে মানুষকে রক্ষা না করবেন ততদিন আপনাদের সব ধর্মপরিচয় ও ধর্মপালনের দুই পয়সারও মূল্য নেই।

ধর্মের এই সত্যটি তাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাতে হবে। তাদের মধ্যে মানুষ হিসাবে, এক বাবা-মায়ের সন্তান হিসাবে ঐক্যচেতনা জাগ্রত করতে না পারলে সংবিধানের শুষ্ক ধারা-উপধারায় কোন লাভ হবে না। 'ধর্ম যার যার - উৎসব সবার' এ জাতীয় শ্রুতিসুখকর শ্লোগান আত্মার গভীরে থাকা কলুষতা ও বিদ্বেষকে সাফ করতে পারবে না। তাছাড়া ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি বিভিন্নভাবে পারস্পরিক বিদ্বেষ জিইয়ে রাখছেন। তারা নিরবধি প্রচার করে যাচ্ছেন যে, বাঙালি সংস্কৃতি হিন্দুয়ানী সংস্কৃতি, হিন্দুরা জঘন্য মানুষ, অমুক খাবার হিন্দুদের, বাংলা ভাষাও হিন্দুদের, এই ভাষায় সন্তানের নাম রাখাও হিন্দুয়ানী ইত্যাদি। উল্টোদিকে হিন্দু ধর্মগুরুরাও মুসলিমদের বিষয়ে ঘৃণা-বিস্তার ও অপপ্রচারে লিপ্ত। এমন কি তাদের শিক্ষা মতে মুসলিমরা তাদের খাবার পাত্র স্পর্শ করলেই খাদ্য 'অভক্ষ' হয়ে যায়। এই রকম বিদ্বেষের শিক্ষা যতদিন প্রচারিত হবে, সাম্প্রদায়িকতার দেওয়াল ভাঙবে না। হৃদয়ের গভীরে পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা জন্ম না নিলে, ধর্মীয় ঐক্যসূত্র সৃষ্টি না করে যতই পাহারা দেয়া হোক, যতই আইন রচনা করা হোক সব উলু বনে মুক্তো ছড়ানো হবে।

আমরা হেযবুত তওহীদ আন্তঃধর্মীয় সমাবেশ, সেমিনার, আলোচনা সভা ইত্যাদির আয়োজন করে সেখানে বিভিন্ন ধর্মের বিজ্ঞজন ও সাধারণ মানুষের সামনে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে এবং পত্রিকায় নিয়মিত লিখে, হ্যান্ডবিল, পুস্তিকা ইত্যাদির মাধ্যমে এই বিষয়ে প্রচার করে যাচ্ছি। আমরা সকল ধর্মানুসারীদের প্রতি সাধারণ আহ্বান পেশ করছি যে, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষ যেখানে বিপন্ন, সেখানে মানুষের জীবনে শান্তি, স্বস্তি, নিরাপত্তা ও মনুষ্যত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে যতই এবাদত-বন্দেগী, পূজা-অর্চনা, প্রার্থনা করা হোক সব অর্থহীন। এমন অবস্থায় তাদের প্রত্যেকের ধর্ম পরিচয়ের কানা পয়সা মূল্যও স্রষ্টার কাছে নেই।

রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্মের যোগ কী করে সম্ভব?

এতক্ষণ যে বিষয়টি সুস্পষ্ট করার জন্য চেষ্টা করলাম তার সারমর্ম হচ্ছে খ্রিষ্টীয় মতবাদের নামে মধ্যযুগীয় নিষ্পেষণ, রাজতন্ত্র আর চার্চের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ও গৃহযুদ্ধের (Power struggle and civil war) হাত থেকে বাঁচার জন্য পশ্চিমারা ধর্মকেই সামষ্টিক জীবনের সবগুলো অঙ্গন থেকে পরিত্যাগ করে ধর্মহীন একটা সভ্যতার জন্ম দিয়েছে। সেই সভ্যতাকে তারা দুনিয়াময় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছে। তবে ইতোমধ্যেই প্রমাণ হয়েছে তাদের এই প্রতিষ্ঠা দু দিক থেকেই ব্যর্থ হয়েছে। একটি জীবনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করাই বড় কথা নয়, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজীবনে শান্তি প্রদান করা। ধর্মনিরপেক্ষ ধারণা ইউরোপে আমেরিকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেকাংশেই কিন্তু শান্তি দিতে পারে নি। বরং তারাই বাকি দুনিয়ার জন্য অশান্তি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, রক্তপাতের মূল কারণ হিসাবে প্রতীয়মান হচ্ছে। নিজেদের দেশেও তারা ভোগবিলাস ও আরাম আয়েশ সত্ত্বেও নিরাপত্তাহীনতা ও অশান্তির মধ্যে বাস করে। দ্বিতীয়ত, যাদের ধর্মে জাতীয় জীবনের বিধি বিধান আছে তাদের দ্বারা এই ব্যবস্থা গৃহীতই হয় নি। যেমন মুসলিম, সনাতন, ইহুদিরা হৃদয় থেকে ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারছে না এবং ধর্মকে যতই বিতাড়িত করা হোক, তা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তাদের জাতীয় জীবনে প্রভাব বিস্তার করে। এবং সেই প্রভাবটা প্রায় সব ক্ষেত্রেই হয় নেতিবাচক।

তাহলে এখন কী করণীয়?

এখন করণীয় হলো যেভাবে ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে পৃথক করা হয়েছিল ঠিক সেভাবে আবার তা রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। এ কথাটি শুনেই যেন কেউ ধরে না নেয় যে আমরা মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র (Theocratic State) এর কথা বলছি। মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র জবরদস্তিমূলক ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পরিপন্থী হওয়ায় অশান্তিপূর্ণ, তাই সেটা কখনোই ধর্মের শাসন নয়, সেটা ধর্মের নামে ফ্যাসিবাদমাত্র। সেটা আধুনিক বিশ্বে টেকসইও হবে না। এখন যেটা করতে হবে তা হলো, বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এই ধর্মবিশ্বাসকে রাষ্ট্রের কল্যাণকর কাজে ব্যবহার করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসী জনগণের ঈমানকে আর ব্যক্তি পর্যায়ে বৃত্তবন্দী রাখা যাবে না। রাখলে তা ধর্মব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণেই থেকে যাবে আর ধর্মব্যবসায়ীরা দুই দিন পর পর বিভিন্ন ইস্যু ধরে ফতোয়াবাজি করে মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে সহিংসতা ও উগ্রতার দিকে নিয়ে যাবে; ঈমানকে ভুল খাতে প্রবাহিত করে দেশ ও জাতির জন্য ক্ষতিকর উপাদান হিসাবে ধর্মকে ব্যবহার করবে। তাতে সমান্তরালভাবে মুক্তচিন্তার দাবিদার মানুষের ধর্মবিদ্বেষই বৃদ্ধি পাবে ও জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডও বৃদ্ধি পাবে। মানুষকে ভুল বুঝিয়ে ধর্মকে ব্যবহার করে গোষ্ঠী ও রাজনীতিক স্বার্থ হাসিল করবে। তাই "ধর্ম যার যার - রাষ্ট্র সবার" অথবা "ধর্ম যার যার - উৎসব সবার" ইত্যাদি কথা বলে ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টির পথ রুদ্ধ করা যাবে না। এমন কি এই কথা বলে ধর্মকে এত সামান্য বিষয় মনে করে অবজ্ঞা করার সুযোগ নেই। সারা পৃথিবীতে যুগপৎ ধর্মবিদ্বেষ ও ধর্ম উন্মাদনার একটি জোয়ার বইছে। জঙ্গিগোষ্ঠী গুপ্তহত্যা করছে একের পর এক ধর্মবিদ্বেষী লেখক, ব্লগার, প্রকাশককে। সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডও হচ্ছে, শিয়া-সুন্নী বিভেদও প্রকট হচ্ছে রক্তপাতের মাধ্যমে। ঘৃণাভিত্তিক বিভিন্ন মঞ্চের চেতনাব্যবসা আর ধর্মীয় আবেগভিত্তিক নানা আন্দোলনের জজবার বাড়াবাড়ি এবং এসবের পরিণামে সৃষ্ট রক্তময় ঘটনাগুলো বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ দিনপঞ্জিতে বিরাট প্রভাব বিস্তার করবে যা হয়তো অনেকেই এখনো অনুধাবন করতে পারছেন না। সুতরাং ধর্মের নিয়ন্ত্রণ আর ধর্মজীবী শ্রেণিটির হাতে রাখা যাবে না, রাখলে তা পুনঃ পুনঃ একই রকম দুঃখজনক পরিস্থিতির জন্ম দেবে। মানুষের ধর্মবিশ্বাসকে জাতি ও রাষ্ট্রের স্বার্থে জাতির কল্যাণে ব্যবহার করতে হবে। ধর্মবিশ্বাসকে অবজ্ঞা করে নয় বরং বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে কাজে লাগানোই উত্তম পন্থা, কিন্তু কীভাবে?

ধর্ম আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে তাতে এ কথাটি বোঝা কঠিন, কেননা ধর্মের কাজ বলতে এখন কেবল দাড়ি, টুপি, জোব্বা, নামাজ, রোজা ইত্যাদিই ধরা হয় আর এগুলোকে রাষ্ট্রের কল্যাণে কী করে ব্যবহার করা যেতে পারে? সেটা হচ্ছে জাতির সামনে ধর্মকে সঠিক রূপে উপস্থাপন করতে হবে। আজ 'রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম' মানেই হচ্ছে দোররা মারা, চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া, নারী নেতৃত্ব হারাম

করে দেওয়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ, সিনেমা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য এই কু-ধারণা প্রচার করা হয়েছে। এর পেছনে কট্টরপন্থী কিছু মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অতি-বিশ্লেষণকারী ওলামা শ্রেণি দায়ী। এই প্রপাগান্ডার স্বচ্ছ জবাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রকৃত ধর্ম জানতে পারলে মানুষ বুঝবে যে দোররা মারা ইত্যাদি ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, ইসলামের উদ্দেশ্য মানবসমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা সৃষ্টি করা। মানুষকে প্রকৃত ধর্মের শিক্ষা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা গেলে মানুষ তখন জাতির ক্ষতি হয়, জাতীয় সম্পদ নষ্ট হয় এমন কোনো কাজ তো করবেই না, বরং প্রতিটি মানুষ জাতির কল্যাণে একেকজন অতন্দ্র প্রহরীতে পরিণত হবে। তাদের সামনে জাতির ঐক্য নষ্ট হয় এমন কোনো কথাও কেউ বলতে সাহস করবে না। এই শিক্ষাও ধর্মেই আছে, কিন্তু সেটাকে চাপা দিয়ে অনেক গুরুত্বহীন বিষয়কে, বহু আপেক্ষিকতার উপর নির্ভরশীল বিষয়কে জল ঘোলা করার জন্য প্রথম লাইনে টেনে আনা হয়েছে। জল ঘোলা করার উদ্দেশ্য কোথাও ধর্মব্যবসা, কোথাও অস্ত্রব্যবসা।

মনে রাখতে হবে যে, একটি সিস্টেম যতই নিখুঁত হোক না কেন তা যদি একদল ক্ষমতালোভী, স্বার্থপর, বদলোকের হাতে পড়ে তাহলে ঐ সিস্টেম মানুষকে শান্তি দেবে না, কারণ তারা ক্ষমতাকে স্বার্থের জন্য ব্যবহার করবে। মানুষ বৈষয়িক দিক থেকে নির্লোভ হবে তখনই যখন সে এই কাজের বিনিময়ে আল্লাহর কাছ বিপুল পুরস্কার লাভ করবে বলে বিশ্বাস করবে। কোনোরূপ বিনিময় ছাড়া কেউ কোনো কাজ করবে এটা মানুষের স্বভাবজাত নয়, আত্মিক প্রেরণা থেকে দু-একজন করতে পারে কিন্তু তা জাতীয়করণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষকে তার প্রকৃত এবাদত ও মানবজীবনের সার্থকতা বোঝানো হলে এখন যেমন তারা ব্যক্তিস্বার্থে জাতির ক্ষতি করে তখন তারা বিপরীত করবে, তারা নিজের সর্বস্ব কোরবানি দিয়ে জাতির সমৃদ্ধির জন্য প্রয়াস করবে। তাদেরকে নেতার আনুগত্যের গুরুত্ব বোঝানো হলে এখন যেমন তারা যে কোনো বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনর্থক বিরোধিতা করে সহিংস ঘটনা ঘটায় তখন তারা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের যে কোনো নির্দেশ জাতির কল্যাণার্থে মাথা পেতে গ্রহণ করবে। এখন যেমন তারা সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বুঝেও মিথ্যা ও অন্যায়ের পক্ষে যায়, তখন তা করবে না। যে কোনো ত্যাগের বিনিময়েও সত্যের পক্ষ নেবে। কেননা তারা নিশ্চিতভাবে জানবে যে এই কাজের বিনিময় তারা স্রষ্টা থেকে লাভ করবে। এখন তারা যেমন ক্ষুদ্র লাভের জন্য খাদ্যে বিষ মেশায়, ঔষধে ভেজাল দেয়, খুন, হত্যা, ষড়যন্ত্র, গুম ইত্যাদি চালায় তখন তারা সেটা আর করবে না। অর্থাৎ সৎ মানুষ তৈরি হবে, মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা হ্রাস পেলে সমাজও অপরাধমুক্ত হবে। তখন মানুষ চাকুরিসুলভ মানসিকতা পরিহার করে নিজেদেরকে মানবতার কল্যাণে উদ্দীপ্ত করবে এবং সম্মিলিত সচেতন প্রয়াসে জাতিকে সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে। জাতির মধ্যে এই জাগরণ সৃষ্টি করতে হলে তাদের ধর্মবিশ্বাসকেই কাজে লাগাতে হবে। কেননা যে কাজগুলোর কথা বললাম এ সবগুলো কাজের প্রবণতা সৃষ্টির উপাদান ধর্মের মধ্যে রয়েছে। না লাগানো হলে ধর্ম মানুষের কোনো কল্যাণেই লাগবে না, উল্টো ধর্মব্যবসায়ীদের অঙ্গুলি হেলনে অকল্যাণেই লাগবে।

আজ 'রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলাম' মানেই হচ্ছে দোররা মারা, চুরি করলে হাত কেটে দেওয়া, নারী নেতৃত্ব হারাম করে দেওয়া, গান গাওয়া, ছবি আঁকা, ভাস্কর্য নির্মাণ, সিনেমা, মূর্তিপূজা ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়া। ইসলাম সম্পর্কে মানুষের মনে ভীতি সৃষ্টি করার জন্য এই কু-ধারণা প্রচার করা হয়েছে। এর পেছনে কট্টরপন্থী কিছু মোল্লাতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও অতি-বিশ্লেষণকারী ওলামা শ্রেণি দায়ী। এই প্রপাগান্ডার স্বচ্ছ জবাব মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে। প্রকৃত ধর্ম জানতে পারলে মানুষ বুঝবে যে দোররা মারা ইত্যাদি ইসলামের উদ্দেশ্য নয়, ইসলামের উদ্দেশ্য মানবসমাজে ঐক্য, ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা সৃষ্টি করা।

এখন সেগুলো কে মানবজাতিকে প্রদান করবে? সেটা করার জন্যই হেযবুত তওহীদ। এই ধারণাগুলো আল্লাহ হেযবুত তওহীদকে দান করেছেন। কারণ এই সৃষ্টি আল্লাহর, এই পৃথিবীও আল্লাহর। এই পৃথিবী ও মানবজাতি যখন ধ্বংসের পরিস্থিতিতে চলে যায়, সমস্যা এমন ঘনীভূত হয় যে মানুষ কোনোক্রমেই আর সেখান থেকে বেরোতে পারে না, তখন আল্লাহ স্বয়ং হস্তক্ষেপ করেন। তিনিই কোনো না কোনো উপায়ে তাঁর সৃষ্টিকে রক্ষা করেন, সৃষ্টিতে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। এই সুরক্ষা তিনি

পশ্চিমা সভ্যতা এতটাই প্রতারক যে তাদেরকে মানুষ শত্রু নয়, মিত্রও নয় একেবারে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। তারা গরু মেরে জুতা দান করলে আমরা সে জুতায় চুমু খাই আর ভাবি আরেক পাটি জুতা কবে জুটবে। আমাদেরকে এই হীনম্মন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শত্রু-মিত্র চিনতে হবে।

মানুষদের মধ্য দিয়েই করেন। হেযবুত তওহীদকে আল্লাহ ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা প্রকৃত রূপ দান করেছেন। আমরা জাতির কল্যাণে, মানবতার কল্যাণে আসন্ন এই মহা বিপর্যয় সঙ্কট থেকে রক্ষার জন্য সকল নবী রসুলের আনীত ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরতে চাই। শুধু চাই-ই না, আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছি তুলে ধরার। অনেকের কাছে অবিশ্বাস্য হলেও এটা সত্য যে, এই কাজে আমাদের কোনো বৈষয়িক স্বার্থ, কোন ভিন্ন অভিপ্রায় নেই। আমরা জানি যে, এটা আল্লাহর প্রকৃত ইসলামের কাজ, তাই আমরা আল্লাহর কাছে এর প্রতিদান অবশ্যই পাব।

কাজেই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ ও সর্বস্তরের মানুষকে আমাদের সম্পর্কে জানার ও বোঝার জন্য আহ্বান করছি। অন্যের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে, অন্যের দ্বারা প্ররোচিত না হয়ে আমাদের সম্পর্কে সঠিক ও সত্য জানুন। তারপর গ্রহণ করার মতো হলে গ্রহণ করুন, না হলে প্রত্যাখ্যান করুন। কিন্তু অস্পষ্ট বা ভুল ধারণা যেন না থাকে। গণমাধ্যমের প্রতিও এই কথা। তাদের শক্তিশালী প্রচারযন্ত্রের দ্বারা এই সত্যগুলো মানুষের সামনে তুলে ধরে জাতির জীবনরক্ষায় ভূমিকা রাখুন।

শেষ কথা

মানবজাতির মধ্যে যত প্রকার অশান্তি বিরাজ করে তার মূল কারণ একটি নিখুঁত জীবনব্যবস্থার অভাব। বর্তমানে জীবনব্যবস্থার নির্মাতা যেহেতু পশ্চিমা 'সভ্যতা' দাজ্জাল, তাই তারাই সকল অশান্তির মূল কারণ। তারা মানবজাতি ও মানবতার মূল প্রতিপক্ষ। প্রতিপক্ষ চিহ্নিত করা সবসময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু পশ্চিমা সভ্যতা এতটাই প্রতারক যে তাদেরকে মানুষ শত্রু নয়, মিত্রও নয় একেবারে দেবতার আসনে বসিয়ে রেখেছে। তারা গরু মেরে জুতা দান করলে আমরা সে জুতায় চুমু খাই আর ভাবি আরেক পাটি জুতা কবে জুটবে। আমাদেরকে এই হীনম্মন্যতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে, জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। শত্রু-মিত্র চিনতে হবে। পশ্চিমারা গত ২০০ বছরে শত শত ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে পৃথিবীর পরিবেশ, জলবায়ুকে প্রায় ধ্বংস করে ফেলেছে। কত কোটি মানুষ হত্যা করেছে তার ইয়ত্তা নেই। তারা ডিভাইড অ্যান্ড রুল নীতি চাপিয়ে দিয়ে আজো আমাদেরকে ঐক্যহীন করে একে অপরের বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন করে রেখেছে। কোনো ইস্যুতেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হতে পারি না। তারা আধুনিক, তাই তাদেরকে অনুসরণ না করে উপায় নেই - এ কথার ভিত্তিতে আমরা তাদের অনুসরণ করে যাচ্ছি। কিন্তু যাচ্ছি কোথায় সেটাও তো দেখতে হবে। আমি কি তাদের অনুসরণ করতে করতে নিজের দেশটাকেই ধ্বংস করে ফেলব, আমি কি তার পেছন পেছন গিয়ে সাগরে ডুবে মরব, উদ্বাস্তু হবো? সিদ্ধান্ত এই মুহূর্তে নিতে হবে।

এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী

জাতির কালঘুম ভাঙ্গাতে যে সূর্যের উদয়

এস এম সামসুল হুদা

দুনিয়াময় এই যে মুসলিম নামক প্রায় ১৬০ কোটির জনসংখ্যা, যাদেরকে আল্লাহ কোর'আনে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলেছেন, যাদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন দুনিয়াময় শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আজ তারা নিজেরাই অন্যায় অবিচার, যুদ্ধ, হানাহানি, রক্তপাত, দারিদ্র্য, অশিক্ষা অর্থাৎ চরম অশান্তিতে নিমজ্জিত হয়ে আছে। সর্বদিক থেকে সর্বনিকৃষ্ট জাতিতে পরিণত হয়েছে। অথচ তাদের আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে, কোর'আনের প্রতি বিশ্বাস আছে, নামাজ পড়ে, হজ করে, দাড়ি, টুপি, পাগড়ী সবই আছে শুধুমাত্র ইসলাম সম্পর্কে প্রকৃত আকীদা (Comprehensive Concept) অর্থাৎ শেষ ইসলামের উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের প্রক্রিয়া-প্রশিক্ষণ সম্বন্ধে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে এই মহান জাতি আজ আটলান্টিকের তীর থেকে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত প্রায় অর্ধ পৃথিবীতে মৃত লাশের মতো পড়ে আছে। তারা এমন কাল ঘুমে ঘুমিয়েছে যে একে জাগাবার জন্য শক্ত আঘাত ছাড়া উপায় নেই। হেযবুত তওহীদের এমাম, এমামুযযামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী তাঁর লিখিত এ ইসলাম ইসলামই নয়, ইসলামের প্রকৃত রূপরেখা, ইসলামের প্রকৃত সালাহ, দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান-সভ্যতা! সহ সকল বইয়ে, বক্তব্যে, আলোচনায় জাতির এই কালঘুম ভাঙ্গানোর জন্য শক্ত আঘাত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'জানি না, কয়জনের ঘুম ভাঙ্গবে, কয়জনের অন্ধত্ব ঘুঁচবে। হেদায়াত, পথ-প্রদর্শন নিশ্চয়ই আমার হাতে নয়, আল্লাহ বলেছেন- তা তাঁর হাতে। কাকে তিনি হেদায়াত করবেন, অন্ধত্ব ঘুঁচাবেন, কাকে নয়, আমি জানি না। আমি শুধু জানি- আল্লাহর শেষ প্রেরিত, শেষ রসুল মোহাম্মদ (সা.) বিন আবদাল্লাহ যে জীবন-ব্যবস্থা, যে দীন আল্লাহর কাছ থেকে এনে মানব জাতিকে একসঙ্গে উপহার দিয়েছিলেন, আজকের ইসলাম সেই দীন নয়, যে জাতি তিনি সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, আজকের মুসলিম নামধারী উম্মতে মোহাম্মদীর দাবিদার এই বিরাট জাতিটি সেই জাতিও নয়।সংস্কৃতিতে একটা কথা আছে- ফলেন পরিচয়তে! গাছের ফল থেকেই তার পরিচয়, শত যুক্তি তর্কে তা বদলানো যাবে না। কাজেই চার পাঁচ লাখ মানুষের সেই ছোট্ট জাতিটির কাজের ফল, আর গত কয়েক শতাব্দী ধরে যে বিরাট জাতিটি শত্রুর গোলামি-দাসত্ব করল, এবং দাসত্ব থেকে আংশিক মুক্তি পাওয়ার পরও যে জাতি স্বেচ্ছায় দাসত্ব করছে, গায়রুল্লাহর ইবাদত করছে, এই দু'টোকেই সেই একই জাতি বলে বিশ্বাস করা, একটি সুমিষ্ট আম গাছ আর একটি তিক্ত মাকাল ফলের গাছ, দু'টোকেই একই গাছ বলে বিশ্বাস করা বা যুক্তি-তর্ক দিয়ে তা প্রমাণ করার চেষ্টার মতই নির্বুদ্ধিতা ও নিষ্ফল।' বুদ্ধি হবার পর থেকেই তাঁর মনে একটি প্রশ্ন নাড়া দিচ্ছিল, তখন ঐ সময়ে এই উপমহাদেশসহ প্রায় সমস্ত মুসলিম দুনিয়া ইউরোপিয়ান জাতিগুলোর শাসনাধীন অর্থাৎ পাশ্চাত্য খ্রিষ্টান শক্তির দাস। এই বিশাল জাতিটাকে ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্রগুলো টুকরো টুকরো করে ভাগ করে এক এক রাষ্ট্র এক এক টুকরো চুষে খাচ্ছিল। তিনি সবার কাছে শুনতেন, বিশেষ করে ওয়াজে মাওলানা মৌলভীদের কাছ থেকে শুনতেন যে ইসলামই একমাত্র সঠিক ধর্ম, এই জাতিই আল্লাহর কাছে গৃহীত, আর সব দোযখে যাবে। এই জাতিটি, বিশেষ করে এই আলেম মৌলভীরা

আল্লাহর অতি প্রিয়, তাদের জন্য আল্লাহ জান্নাত সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর মনে খটকা লাগত, তাই যদি হবে, শুধু আমরাই যদি সত্য পথের পথিক হই, তবে আমাদের এই ঘৃণার দাসত্ব কেন? তিনি মৌলভীদের কাছে প্রশ্ন করলে তারা বুঝিয়ে দিতেন- আল্লাহ অন্যদের অর্থাৎ আমাদের খ্রিষ্টান প্রভুদের এই দুনিয়া ভোগ করতে দিয়েছেন এ জন্য যে তাদের পরকালে জাহান্নামে দেবেন আর আমাদের দরিদ্র, অশিক্ষা, আর গোলামির মধ্যে রেখেছেন এই জন্য যে আমাদের আখেরাত অর্থাৎ পরকালে সুখ দেয়া হবে। কোর'আন-হাদিস উল্লেখ করে বুঝিয়ে দিতেন- এই দুনিয়াটা কত খারাপ জায়গা। এর কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে, চোখ-কান বুঁজে নামাজ, রোজা, ইত্যাদি করতে করতে জীবনটা কোনোরকম কাটিয়ে দিতে পারলেই পরকালে একেবারে জান্নাতুল ফেরদৌসে জায়গা পাওয়া যাবে। ঐ বয়সে তিনি তাই বুঝলেন। কিন্তু পরে যখন ইতিহাস পড়লেন, তখন দেখলেন যে মহানবীর পর তাঁর সৃষ্ট জাতি পৃথিবীতে ঠিক সেই স্থান দখল করেছিল যে স্থানে আজ আমাদের প্রভু ঐ ইউরোপীয় জাতিগুলো দখল করে আছে। অর্থাৎ অর্থনৈতিক, সামরিক, রাজনৈতিক, পার্থিব সম্পদ, শিক্ষায়, বিজ্ঞানে, নতুন বিষয় অনুসন্ধানে, বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখার গবেষণায়, পৃথিবীর অজানা জায়গায় দুঃসাহসিক অভিযানে তারা যা ছিলেন, আজ পাশ্চাত্য জগত তাই হয়েছে। মওলানা- মৌলভী সাহেবেরা যে জবাব দিয়েছিলেন তার মানে এই হয় যে- ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঐ মুসলিমদের আল্লাহ ইহজগতে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছিলেন আখেরাতে জাহান্নাম দেবেন বলে এবং তখনকার ইউরোপিয়ানদের এবং বর্তমানের আমাদের জান্নাত দেবেন বলে।

কিন্তু কোনভাবেই তাঁর মন সায় দিচ্ছিল না। বার বার কেবলই মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কী একটা ভয়ংকর গোলমাল আছে, কোথাও এক বিরাট শুভংকরের ফাঁকি আছে। তাঁর অবচেতন মন থেকে বোধহয় স্রষ্টার কাছে প্রার্থনা পৌঁছে গিয়েছিল- 'আমাকে বুঝিয়ে দাও! আমাকে বুঝিয়ে দাও! তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল, তোমার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সমস্ত মানবজাতির আদর্শ করে যাকে তুমি তৈরি করেছ (কোর'আন- সুরা আল-আহযাব ২১), যার নামে স্বয়ং তুমি আল্লাহ তোমার মালায়েকদের নিয়ে দরুদ ও সালাম পাঠাও (কোর'আন- সুরা আল-আহযাব ৫৬), তাঁর জাতি আজ ঘৃণিত দাস কেন? দেখতে পাচ্ছি এরা তোমায় বিশ্বাস করে। তা না করলে তো আর নামাজ পড়ত না, রোজা রাখত না, যাকাত দিত না, হজ্ব করত না, দাড়ি রাখত না, মোছ কাটতো না, এত নফল ইবাদত করত না, কোরবানি দিত না, খাতনা করত না, পাড়া মহল্লা কাঁপিয়ে জিকির করত না। এরা তো এ সবই করে, শুধু তাই নয় এদের মধ্যে অনেকে তো খানকায় বসে কঠিন আধ্যাত্মিক সাধনাও করে, আধ্যাত্মিকতার বহু স্তর অনেকে অতিক্রম করেছেন। তবু কেন আমরা বিধর্মীদের পদদলিত দাস? কোথায় গলদ, কোথায় ফাঁকি?'

এই মহাবিশ্বের সর্বশক্তিমান স্রষ্টা তাঁর এই বান্দার মনের আকুল জিজ্ঞাসা শুনলেন। এরপর ধীরে ধীরে একটু একটু করে তাঁর মনের এই প্রশ্নের উত্তর আসতে লাগল- সারা জীবন ধরে। এখানে একটু, ওখানে একটু, বইয়ের পাতায়, ছোটখাট ঘটনায়, নিজের চিন্তার মধ্যে দিয়ে এমন কি চিন্তা না করেও হঠাৎ নিজে নিজেই জবাব মনের মধ্যে এসে যাওয়া, এমনি করে পেঁয়াজের খোসা ছাড়াবার মতো একটি একটি করে সমস্ত আবরণ ঝরে পড়তে লাগল। এভাবেই তাঁর সেই 'কেন'র জবাব তিনি পেয়েছেন জীবনের একটি পর্যায়ে এসে, তাঁর পরিণত বয়সে। তিনি জানতে পারলেন কোথায় গলদ, কোথায় সেই শুভংকরের ফাঁকি, যে ফাঁকিতে পড়ে আজ যে জাতির পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি হবার কথা- সেই জাতি পৃথিবীর নিকৃষ্টতম জাতিতে পরিণত হয়েছে। আল্লাহর সার্বভৌমত্বের, তওহীদের ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সমস্ত জীবন-ব্যবস্থা, দীন অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই সার্বভৌমত্ব, তওহীদ যেমন পৃথিবীর কোন জাতির মধ্যে নেই, তেমনি এই তথাকথিত 'মুসলিম' জাতির মধ্যেও নেই। অন্য সব ধর্ম ও জাতি যেমন এবং যতখানি বহুত্ববাদের, শিরক, কুফরে ও নাস্তিক্যে ডুবে আছে এই জাতিও ততখানিই ডুবে আছে। অন্য ধর্মের মানুষগুলোর মতো এই ধর্মের মানুষগুলোও বুঝছে না, কেমন করে আজ আর তারা মুসলিম নেই। আকিদার (Concept) বিকৃতিতে তওহীদ এদের কাছে শুধু মাটির, পাথরের তৈরি মূর্তিকে সাজদা না করার মধ্যে সীমাবদ্ধ। তওহীদের মূল কথা হল, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রসুলাল্লাহ (সা.)" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন হুকুমদাতা, নির্দেশদাতা নাই এবং মোহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল। এই কলেমা হচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে মানুষের একটি অঙ্গীকার বা চুক্তি যাতে বলা হয়েছে, জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, অর্থনৈতিক, বিচারিক, শিক্ষা অর্থাৎ যে স্তরেই হোক, যে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রসুলের কোন কথা আছে, হুকুম আছে সেখানে অন্য কারো কথা বা হুকুম মানা যাবে না। যে বা যারা অন্য কারো হুকুম মানবে তারা এই কলেমার চুক্তি ভঙ্গ করবে, ফলে কাফের ও মোশরেক হয়ে যাবে। আল্লাহর শেষ রসুলের মাধ্যমে প্রেরিত ইসলামের শেষ সংস্করণ আর বর্তমানের "ইসলাম ধর্ম" যে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী জিনিস তা পরম করুণাময় আল্লাহর রহমে তাঁর কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিল। তিনি প্রভুর কাছে বুঝতে চেয়েছিলেন কোন অপরাধে, কোন গলদে তার শ্রেষ্ঠ রসুলের জাতি

দারিদ্র্যে, অশিক্ষায়, কুশিক্ষায়, প্রায় পশু পর্যায়ের জীবে পরিণত হয়ে মোশরেক ও কাফেরদের গোলামে পরিণত হোল। রহমানুর রহীমের অনুগ্রহে এই মহাসত্যগুলো বুঝার পরে তিনি মহাবিপদে পড়ে গেলেন, ঘাড়ে এসে পড়লো ভয়াবহ দায়িত্ব। তিনি জানতেন মহানবীর বাণী- যে লোক জ্ঞান পেয়েও তা মানুষকে জানায় না, কেয়ামতে তার পেটে আগুন পুরে দেওয়া হবে। মহানবী এও বলেছেন- যে হাশরের দিনে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে। এর অর্থ এ দায়িত্ব যেমন করেই হোক ঘাড় থেকে নামাতেই হবে। ভেবে দেখলেন তাঁর সামনে দু'টো পথ। প্রথমটা, যে সত্য তাঁকে বোঝানো হয়েছে তা প্রকাশ্যে প্রচার করা। দ্বিতীয়টা-লিখে মানুষকে জানানো। প্রথমটার কথা চিন্তা করতেই বিশ্বনবীর আরেকটা হাদিস তাঁর মনে এলো। তা হচ্ছে এই যে- দীন যখন বিকৃত হয়ে যাবে তখন যে ব্যক্তি প্রকৃত দীনকে মানুষের মধ্যে প্রচার করবে, তার দরজা, স্থান নবীদের দরজা থেকে মাত্র এক দরজা (step) নীচু হবে। এ হাদিসের মর্ম বড় ভয়াবহ। প্রত্যেক প্রেরিত, নবী যখন তাঁর পূর্ববর্তী নবীর মাধ্যমে দেয়া দীনের বিকৃতি শোধরাতে চেষ্টা করেছেন, মানুষকে বিপথ থেকে সঠিক পথে আনতে চেষ্টা করেছেন তখন তাঁর ভাগ্যে জুটেছে অপমান, বিদ্রুপ, বিরোধিতা ও সর্বপ্রকার অত্যাচার। আর ঐ অপমান, অত্যাচারের পুরোভাগে সবসময় থেকেছে ঐ বিকৃত ধর্মের পুরোহিত, যাজক শ্রেণি। নবী-রসুলদের কোন পথ ছিল না ঐ অপমান অত্যাচার সহ্য করা ছাড়া, কারণ তাদের পাঠানোই হয়েছিল ঐ কাজ দিয়ে। কিন্তু নবী-রসুল না হয়েও যদি কোনো সাধারণ মানুষ ঐ কাজ করতে যায়, তবে তারও ভাগ্যে তাই জুটবে যা প্রত্যেক নবী-রসুলের ভাগ্যে জুটেছে। তাই মহানবী বলেছেন, সেই সাধারণ মানুষেরও সম্মান হবে নবীদের চেয়ে মাত্র এক ধাপ কম। এমন কি শেষনবী এ কথাও বলে দিয়েছেন যে মাহদীরও (আ.) প্রবল বিরোধিতা করবে এই বর্তমান ইসলামের হর্তা-কর্তারা। মাননীয় এমামুয্যামান বলতেন, 'আমার মতো অতি সাধারণ এবং অতি গোনাহগার মানুষ, নবী-রসুলেরা যে পথে হেঁটে গেছেন সে পথের ধূলি স্পর্শ করার যোগ্যতাও যার নেই, সেই চরিত্রও নেই, আমার পক্ষে ঐ কাজ করা সম্ভব নয়।' স্বভাবতঃই তিনি দ্বিতীয় পথটি বেছে নিলেন। যার ফল হচ্ছে তাঁর লেখা বইগুলো। এই বই লেখার পথ বেছে নিতেও তাঁর দ্বিধা এসেছে, কারণ তিনি নিজেকে লেখক বলে মনে করতেন না, হয়তো গুছিয়ে বলতে পারবেন না, হয়তো বোঝাতেও পারবেন না; কিন্তু তৃতীয় পথ নেই।

আরও একটা কারণ আছে তাঁর এই কাজে হাত দেবার। স্রষ্টার দেয়া জীবন-বিধানকে অস্বীকার করে, নাস্তিক্যের ওপর ভিত্তি করে পাশ্চাত্য 'সভ্যতা' মানব জাতিকে আজ এমন পর্যায়ে নিয়ে এসেছে যে, "আজ সমগ্র মানব জাতিটাই পারমাণবিক আত্মহত্যার দোড়গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে।" এ আত্মহত্যাটা শুধু তাদের হবে না, আমরা যারা ঘৃণিত হীনম্মন্যতায় আল্লাহর দেয়া জীবন-ব্যবস্থাকে তাদের মতো ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ করে রেখে, সমষ্টিগত জীবনে তাদের নকল করছি - আমাদেরও হবে। যদিও সময় বেশি নেই, তবু এখনও যদি পাশ্চাত্য তাদের নিজেদের গড়া জীবন-ব্যবস্থা পরিত্যাগ করে স্রষ্টার শেষ বিধান, শেষ ইসলামকে গ্রহণ করে তবে এ বীভৎস আত্মহত্যার হাত থেকে বেঁচে যেতে পারে। আর তারা যদি তা নাও করে তবে এই বিরাট জাতি, যেটা তার অন্তহীন অজ্ঞতায়, আকিদার অন্ধত্বে নিজেকে মুসলিম ও উম্মতে মোহম্মদী বলে মনে করে আত্মতৃপ্তিতে ডুবে আছে, তাকে ধাক্কা দিয়ে বলা যে- জাগো, দেখো তুমি কোথায় আছো, সমষ্টিগত জীবনে আল্লাহকে বাদ দিয়ে পাশ্চাত্যের, গায়রুল্লাহর ইবাদত করতে করতে কোথায় এসেছ। আখেরাত তো বহু আগেই গেছে, আল্লাহ রসুলের চোখে তো জাতি হিসাবে কার্যতঃ মোশরেক ও কাফের হয়েছ কয়েক শতাব্দী আগেই, এখন ওদের সাথে সাথে এই পার্থিব আত্মহত্যারও সম্মুখীন হয়েছ। এখনও সময় আছে তওবা করে শেরক ও কুফরী ত্যাগ করে মুসলিম হবার। উম্মতে মোহম্মদী হওয়াতো অনেক পরের কথা। শুধু মুসলিম হিসাবে নয়, মানুষ হিসাবেও এ দায়িত্ব পালন তাঁর এইসব লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য।

বই লিখে টাকা উপার্জন তাঁর উদ্দেশ্য নয়। এই বই বিক্রি করে একটি টাকাও উপার্জন করেন নাই বরং তিনি তাঁর পিতৃসম্পদ বিক্রি করে এই দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বিনামূল্যে তাঁর লিখিত বইগুলো বিতরণ করেছেন। পরবর্তীতে যখন ব্যাপক চাহিদা সৃষ্টি হয় তখন শুধু পুনঃমুদ্রনের জন্য একটা নামমাত্র মূল্য রেখেছিলেন। তিনি তাঁর কোন বইয়েরই স্বত্ব রাখেন নাই। তিনি জানতেন তাঁর বইগুলোর প্রচণ্ড বিরোধিতা হবে। সেজন্য তিনি বলতেন, বিরোধিতা যদি না হয় তবে বুঝবো আমি সত্য লিখতে পারি নি, শেষ ইসলামকে তার প্রকৃত আলোকে মানুষের সামনে পেশ করতে ব্যর্থ হয়েছি। এ বিরোধিতা আসবে ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'র পদ্ধতিতে 'শিক্ষিত' বর্তমান নেতৃত্বের ও তাদের অনুসারীদের (Agent) কাছ থেকে, বর্তমানের বিকৃত দীনের পুরোহিত, যাজকদের কাছ থেকে, ধর্ম যাদের রুজী-রোজগারের পথ, তাদের কাছ থেকে, ইউরোপিয়ান খ্রিষ্টানরা মুসলিম জগত অধিকার করে মাদ্রাসা স্থাপন করে ইসলাম শিক্ষার ছদ্মবেশে যে ধ্বংসকারি ফতোয়াবাজী শিক্ষা দিয়েছিল সেই শিক্ষায় 'শিক্ষিত'দের কাছ থেকে, অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, রক্তপাত নির্মূল

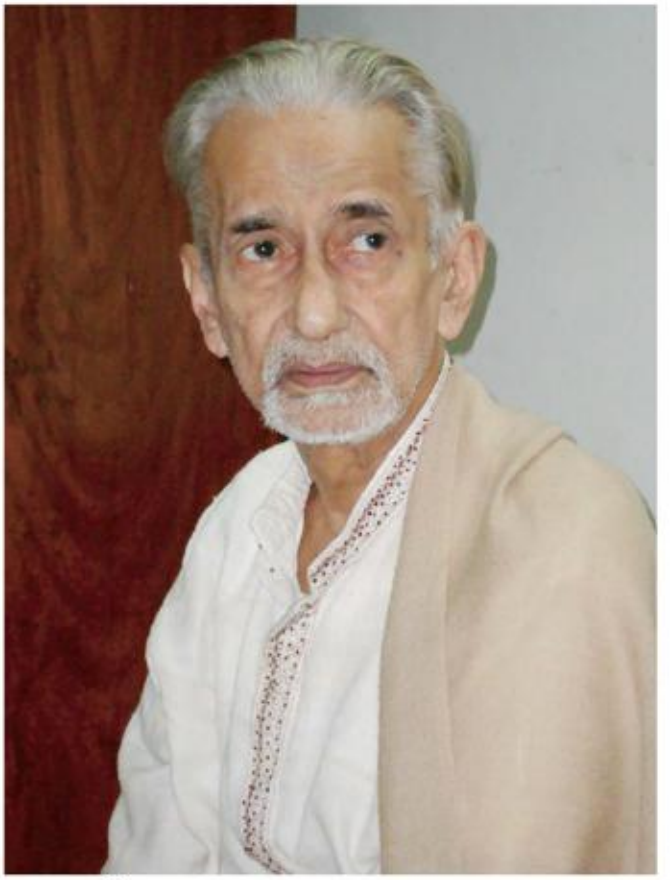

মাননীয় এমামুয্‌যামান The Leader of The Time মনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, যাঁর প্রেরণায় আমরা উজ্জীবিত।

করে পৃথিবীতে আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য নবী করিম (সা.) তাঁর উম্মতের হাতে যে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই তলোয়ার ফেলে দিয়ে তসবিহ হাতে নিয়ে যারা খানকায় ঢুকেছেন তাদের কাছ থেকে। এক কথায় সর্বদিক থেকে বিরোধিতা আসবে।"

বাস্তবেও আমরা তাই দেখতে পেয়েছি, এই সব কটি শ্রেণির দ্বারা তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যাদের সত্য গ্রহণের মন আছে, যারা বুঝতে চাইবেন, তারা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন তিনি কী বলতে চেয়েছেন। তাদের মধ্যে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, আল্লাহ যাদের রেযেক অন্যের চেয়ে বেশি দিয়েছেন তাদের কাছে তিনি অনুরোধ করেছেন তারা যেন তাঁর লিখিত এই বইগুলো পুনঃ মুদ্রণ করেন, যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব হয়। তবে এও বলেছেন যে, "আজকের 'মুসলিম' জাতি বহু নফল ইবাদত করতে রাজী কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় দুই পয়সা খরচ করতে রাজী নয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন- আমি মো'মেনের সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বদলে কিনে নিয়েছি (কোর'আন- সুরা আত-তওবা ১১১)। আমরা ঈমানের দাবিদার কিন্তু জানমাল আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করতে রাজী নই।"

তিনি বলেছেন, 'আমার অক্ষম কলম দিয়ে যা লিখেছি তা আমার কথা নয়- আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা বলেছেন তাই বলছি এবং কোথায় বলেছেন তার উদ্ধৃতিও দিয়েছি।

আল্লাহ তাঁকে যে মহাসত্য দান করলেন তা বোঝার পর তাঁর দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল মানুষের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া। প্রাথমিকভাবে শুধু বই লিখে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও ১৯৯৫ সনে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি হেযবুত তওহীদ নামক একটি আন্দোলন গঠন করতে বাধ্য হন। গত ২০ বছর ধরে এই আন্দোলন শত বাধা, বিঘ্ন, অপবাদ, অত্যাচার ও যুলুম সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানবজাতিকে আল্লাহর তওহীদের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হেযবুত তওহীদ এগিয়ে চলতে থাকল নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে। এভাবে চললো ১৩ বছর। ১৩ বছর ধরেই তিনি জানতেন তিনি যা বলছেন এটাই সত্য ইসলাম, আর যেটা বর্তমানে চালু আছে সেটা সত্য নয়, অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের ইসলাম নয়। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি এটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কি না তা তিনি জানতেন না। ২০০৮ সালে মহামহীম আল্লাহ এক মো'জেজার (অলৌকিক ঘটনা) মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে তিনি এই দীনের যে আত্মা, আকিদা, ধারণা ও রূপ মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করছেন সেটাই একমাত্র হক, সত্য। অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ হক, হেযবুত তওহীদের এমাম হক এবং এই হেযবুত তওহীদ দিয়েই আল্লাহ অন্য সমস্ত জীবনব্যবস্থা লুপ্ত করে তাঁর দীনুল হক, সত্য জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন ইনশা'আল্লাহ। তাই মানবজাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সেই নতুন শান্তিময় বিশ্বব্যবস্থার আগমনের সুসংবাদ মানবজাতিকে

মানুষ দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। একটা সঠিক আদর্শ দ্বারা যতদিন মানুষের আত্মার পরিবর্তন সাধন করা না হবে, এই ভুল জীবনব্যবস্থার পরিবর্তন না হবে, ততদিন পৈশাচিকতা কেউ বন্ধ করতে পারবে না।

হেযবুত তওহীদ

মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

আমাদের কিছু প্রকাশনা

"ডিভাইড এন্ড রুল"
শোষণের হাতিয়ার

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক তথা অধুনা পাশ্চাত্য সভ্যতার আধিপত্যবাদের নীতি হচ্ছে পদানত জাতিকে ধর্ম, রাজনীতি, শিক্ষাব্যবস্থা ইত্যাদির দ্বারা বিভক্ত করে দুর্বল করে দেওয়া। আজ বিশ্বময় বিরাজিত যাবতীয় যুদ্ধ, রক্তপাত ও অশান্তির কারণ এই ষড়যন্ত্রমূলক ব্যবস্থা।

ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল জঙ্গিবাদ

শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করা সম্ভব নয়। এজন্য প্রয়োজন এমন একটি শক্তিশালী আদর্শ যা একাধারে জঙ্গিবাদকে অসার প্রমাণ করবে এবং মানুষকে প্রকৃত মানবতার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তার দুনিয়া ও আখেরাতের জীবনকে শান্তিময় করে তোলার পথ প্রদর্শন করবে।

যুগসন্ধিক্ষণে আমরা

কেন উম্মতে মোহাম্মদীর সৃষ্টি ও উত্থান হয়েছিল, কেমন ছিলেন সেই বিশ্বজয়ী উম্মাহ, কী ছিল তাদের আকিদা, আর আজ কেন সেই জাতি বিশ্বের সকল জাতির গোলাম? দুনিয়াজোড়া কেন এই দুর্গতি? কিভাবে এই অশান্তি থেকে জাতির পরিত্রাণ ঘটবে- এমন সব বৃহৎ প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যাবে এ বইতে।

এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব

রসুলাল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে মুসলিম জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সামরিক শক্তিসহ সকল বিষয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জাতিতে পরিণত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আজ হেযবুত তওহীদ অন্যায় অশান্তিতে নিমজ্জিত, বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত ষোল কোটি বাঙালিকে আহ্বান করছে, যদি একটি মাত্র শর্ত পূরণ করা হয় তবে এ জাতির পায়ে লুটিয়ে পড়বে বিশ্ব।

যোগাযোগ: 01670174643 | 01711005025
01933767725 | 01782188237
01559358647

অরাজনৈতিক আন্দোলন
হেযবুত তওহীদ
মানবতার কল্যাণে নিবেদিত

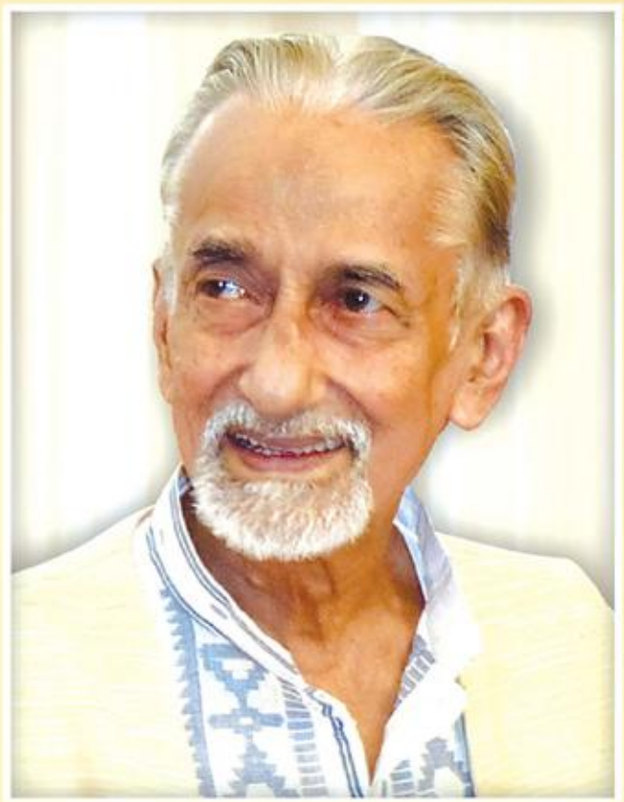

মাননীয় এমামুয্‌যামান The Leader of The Time
জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী, যাঁর প্রেরণায় আমরা উজ্জীবিত।

করে পৃথিবীতে আলাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের জন্য নবী করিম (সা.) তাঁর উম্মতের হাতে যে তলোয়ার ধরিয়ে দিয়েছিলেন সেই তলোয়ার ফেলে দিয়ে তসবিহ হাতে নিয়ে যারা খানকায় ঢুকেছেন তাদের কাছ থেকে। এক কথায় সর্বদিক থেকে বিরোধিতা আসবে।"

বাস্তবেও আমরা তাই দেখতে পেয়েছি, এই সব কটি শ্রেণির দ্বারা তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। যাদের সত্য গ্রহণের মন আছে, যারা বুঝতে চাইবেন, তারা ইনশাল্লাহ বুঝতে পারবেন তিনি কী বলতে চেয়েছেন। তাদের মধ্যে যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, আল্লাহ যাদের রেযেক অন্যের চেয়ে বেশি দিয়েছেন তাদের কাছে তিনি অনুরোধ করেছেন তারা যেন তাঁর লিখিত এই বইগুলো পুনঃ মুদ্রণ করেন, যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব হয়। তবে এও বলেছেন যে, "আজকের 'মুসলিম' জাতি বহু নফল ইবাদত করতে রাজী কিন্তু আল্লাহর রাস্তায় দুই পয়সা খরচ করতে রাজী নয়। অথচ আল্লাহ বলেছেন- আমি মো'মেনের সম্পদ ও প্রাণ জান্নাতের বদলে কিনে নিয়েছি (কোর'আন- সুরা আত-তওবা ১১১)। আমরা ঈমানের দাবিদার কিন্তু জানমাল আল্লাহর রাস্তায় কোরবানি করতে রাজী নই।"

তিনি বলেছেন, 'আমার অক্ষম কলম দিয়ে যা লিখেছি তা আমার কথা নয়- আল্লাহ ও তাঁর রসুল যা বলেছেন তাই বলছি এবং কোথায় বলেছেন তার উদ্ধৃতিও দিয়েছি।

আল্লাহ তাঁকে যে মহাসত্য দান করলেন তা বোঝার পর তাঁর দায়িত্ব হয়ে গিয়েছিল মানুষের কাছে এটি পৌঁছে দেওয়া। প্রাথমিকভাবে শুধু বই লিখে এই দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে চাইলেও ১৯৯৫ সনে এমন একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে আল্লাহর ইচ্ছায় তিনি হেযবুত তওহীদ নামক একটি আন্দোলন গঠন করতে বাধ্য হন। গত ২০ বছর ধরে এই আন্দোলন শত বাধা, বিঘ্ন, অপবাদ, অত্যাচার ও যুলুম সত্ত্বেও সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মানবজাতিকে আলাহর তওহীদের দিকে আহ্বান করে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত হেযবুত তওহীদ এগিয়ে চলতে থাকল নানা বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে। এভাবে চললো ১৩ বছর। ১৩ বছর ধরেই তিনি জানতেন তিনি যা বলছেন এটাই সত্য ইসলাম, আর যেটা বর্তমানে চালু আছে সেটা সত্য নয়, অর্থাৎ আল্লাহ রসুলের ইসলাম নয়। কিন্তু তাঁর এই প্রচেষ্টায় তিনি এটা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন কি না তা তিনি জানতেন না। ২০০৮ সালে মহামহীম আল্লাহ এক মো'জেজার (অলৌকিক ঘটনা) মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে তিনি এই দীনের যে আত্মা, আকিদা, ধারণা ও রূপ মানবজাতির সামনে উপস্থাপন করছেন সেটাই একমাত্র হক, সত্য। অর্থাৎ হেযবুত তওহীদ হক, হেযবুত তওহীদের এমাম হক এবং এই হেযবুত তওহীদ দিয়েই আল্লাহ অন্য সমস্ত জীবনব্যবস্থা লুপ্ত করে তাঁর দীনুল হক, সত্য জীবনব্যবস্থা অর্থাৎ ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবেন ইনশা'আল্লাহ। তাই মানবজাতির এই ক্রান্তিলগ্নে সেই নতুন শান্তিময় বিশ্বব্যবস্থার আগমনের সুসংবাদ মানবজাতিকে জানাচ্ছে হেযবুত তওহীদ।